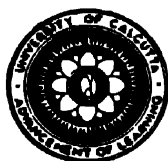
বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষা

(রূপচিত্রাঙ্কন-অবলম্বনে আলোচিত)

শ্রীঅজরচন্দ্র সরকার





কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত

মূল্য দুই টাকা

PRINTED IN INDIA

PRINTED AND PUBLISHED BY SIBENDRANATH KANJILAL,
SUPERINTENDENT (OFFG.), CALCUTTA UNIVERSITY PRESS,
48, HAZRA ROAD, BALLYGUNGE, CALCUTTA

1699B—F

সূচী



ভূমিকা

(১)

অধুনা বঙ্কিম-সাহিত্যের আলোচনা অনেকটা নিশ্চল প্রথাবদ্ধতার মধ্যে বাঁধা পড়িয়াছে। এই সাহিত্যবিষয়ে অভিমত দুইটি পরস্পর-বিরোধী মতবাদে ব্যূহবদ্ধ হইয়াছে। নব্যপন্থী পাঠক ও সমালোচক বঙ্কিমের মধ্যে মার্কস্-প্রবর্তিত শ্রেণী-সংঘাত ও ফ্রড-প্রতিষ্ঠিত যৌনবিজ্ঞানের বিশেষ কোন ছায়াপাত না দেখিতে পাইয়া তাঁহাকে সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ আসন হইতে সরাসরি খারিজ করিয়া দেন। তাঁহার জীবনদর্শন খণ্ডিত ও একদেশদর্শী, তাঁহার মধ্যে বাস্তবতার আদর্শ শিথিল ও ভ্রান্তিসঙ্কুল, তিনি রোমান্সসুলভ ভাববিলাসেব কারবারী, তাঁহার আলোচনা অভিজাত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জীবন-কাহিনীতে সীমাবদ্ধ—ইত্যাদি নানারূপ ত্রুটি-বিচ্যুতি তাঁহার প্রতি যথেচ্ছ আরোপিত হয়।

ইঁহারা ভুলিয়া যান যে, রাম জন্মিবার পূর্বে রামায়ণ-রচনা কবি-কল্পনার বিষয় হইতে পারে,—ঠিক উপন্যাসের বিষয় নয়। সর্বহারার প্রতি বঙ্কিমের সহানুভূতি যে আজকালকার তথাকথিত দীনবন্ধুদের অপেক্ষা কত গভীর ও আন্তরিক ছিল তাহার প্রমাণ তাঁহার সমাজবিষয়ক প্রবন্ধের মধ্যে অখণ্ডনীয়ভাবে নিহিত আছে। কিন্তু তিনি এই বিষয়েব আলোচনার জন্য উপন্যাসকে ঠিক উপযোগী ক্ষেত্র বলিয়া মনে করেন নাই। যাহা সার্বভৌম নহে, সূক্ষ্ম, অবিমিশ্র ভাব-লোকের উপাদান নহে, যাহা বিচার-বিতর্কে কণ্টকিত, মতবাদের রূঢ় সংঘাতে আন্দোলিত, স্থূল ও গ্লানিকর ইন্দ্রিয়-লালসায় মলিন ও নগ্ন দারিদ্র্যের বস্তুস্তূপে অযথা ভারাক্রান্ত, তাহার বিশুদ্ধ রসরূপটি অবাস্তবের প্রক্ষেপে প্রায়ই আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে; সুতরাং বঙ্কিমের শিল্পসৌন্দর্যজ্ঞান এইরূপ বিষয়কে যতদূর সম্ভব পরিহার করিতে চাহিয়াছে। তাঁহার উপন্যাসে দারিদ্র্যের সার্থক ইঙ্গিত আছে—অতিপল্লবিত বিস্তার নাই; লালসার সর্বধ্বংসী প্রভাবের দ্যোতনা আছে—ইহার কুৎসিত, পঙ্কিল ইতিহাস নাই। বস্তু ও বাসনার অসহনীয়

পেষণ স্টামরোলারের মত মানুষের সূক্ষ্ম বৈশিষ্ট্য-গুলিকে দলিয়া-মথিয়া সমান করিয়া দিতে চায়; কাজেই যিনি কেবল করুণরস ছাড়া অন্যান্য রসেরও স্ফুরণাভিলাষী তিনি মানবের অন্তঃপ্রকৃতিকে যতদূর সম্ভব এই জাতীয় সর্বগ্রাসী, সমীকরণকারী অভিভব হইতে মুক্ত রাখিবার পক্ষপাতী। বঙ্কিমচন্দ্রের নায়ক-নায়িকার মধ্যে অনেকেই দরিদ্র—কুন্দনন্দিনী, শৈবলিনী, প্রফুল্ল, শ্রী—ইহারা সকলেই অভাবের সহিত পরিচিত, কিন্তু অভাবের আঁচে ইহাদের প্রকৃতির সরস মাধুর্য ঝলসিয়া যায় নাই, কিংবা আত্মার স্বাধীন উন্মেষ ব্যাহত হয় নাই। দারিদ্র্য যেখানে মানস আভিজাত্য নষ্ট করে, সেখানেই ইহা সত্যই দীন। বিশেষতঃ পঞ্চাশ বৎসর পূর্বের বাঙ্গালী জীবনে আজকালকার অভাব ও যৌন-বুভুক্ষার কেন্দ্রিকতা ছিল না; দারিদ্র্যে বৈরাগ্যের উদারস্পর্শ ও আকাংক্ষায় সংযমের প্রবল প্রতিরোধ শুধু আদর্শের নয়, বাস্তব জীবনযাত্রার সত্য পরিচয় বহন করিত। এই আচারপূত, স্বধর্মনিষ্ঠ, ঐক্য-বোধসংহত সমাজের চিত্রই বঙ্কিমের উপন্যাসে প্রতিবিম্বিত। বর্তমান যুগের বিশৃঙ্খলা ও অন্তর্জীর্ণ

বিকার বঙ্কিমের উপন্যাসে নাই বলিয়া তিনি অনেকের রুচির নিকট স্পৃহণীয় না হইতে পারেন, কিন্তু এই হেতুবাদে তাঁহার সৃষ্টি-প্রতিভার অস্বীকারকে বিচার-বিপর্যয় ছাড়া আর কি বলা যাইতে পারে ?

আর যাঁহারা এখনও বঙ্কিম-প্রতিভার প্রতি আস্থা হারান নাই, তাঁহারাও বঙ্কিমের রসাস্বাদনে আগেকার সেই তীব্র আগ্রহ, সেই সর্বতোমুখী গ্রহণশীলতা হারাইয়াছেন বলিয়া মনে হয়। তাঁহারা বঙ্কিমকে " Classic "এর পর্যায়ে ফেলিয়া তাঁহাদের কর্তব্যের পরিসমাপ্তি করিয়াছেন। যে গ্রন্থ বহু-উল্লিখিত, কিন্তু বিরল-পঠিত তাহাই Classical সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত Classicsএর এইরূপ একটি ঈষৎ শ্লেষাত্মক সংজ্ঞা প্রচলিত আছে। বঙ্কিম-সম্বন্ধে আধুনিক যুগের প্রাচীন-পন্থী লোকের মধ্যে সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি আছে—সানন্দ, সাগ্রহ রসগ্রহণ নাই। তাঁহারা মূল্যবান্ চামড়ায় বাঁধানো ও সোণার জলে নিজেদের নাম-লেখা বঙ্কিম-গ্রন্থাবলীর রাজসংস্করণ তাঁহাদের গ্রন্থাগারের দর্শনীয় অংশে রাখিয়াই সন্তুষ্ট। বড় জোর কোটেশনের ছোট ঘটীতে তাঁহার অমৃতহ্রদ হইতে

দুই-এক গণ্ডূষ পরিমাণ উদ্ধার করা হয়, কিন্তু তাহাতে অবগাহন করিয়া পূর্ণ পরিতৃপ্তি লাভ করিতে পারেন এমন লোকের সংখ্যা কমিয়া আসিতেছে। বঙ্কিমী নেশা, বঙ্কিম-সম্বন্ধে রস-বিভোরতা, তাঁহার যাদুকরী প্রভাবে আত্মসমর্পণের আবেশ আজ টুটিয়া গিয়াছে। সেই উচ্ছ্বসিত স্তুতি, সেই মনঃপ্রাণ-উৎসর্গকারী পূজা, সেই মন্ত্রসুলভ নিগূঢ় শক্তির উপলব্ধি,—সেই প্রশ্নাতীত, সন্দেহাতীত শিষ্যমনোভাব বর্তমান যুগে বিরল। অক্ষয়চন্দ্র সরকার, গিরিজাপ্রসন্ন রায়চৌধুরী, ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও পঁচিশ বৎসর পূর্ব পর্যন্ত মাসিক পত্রে অসংখ্য সমালোচকের ভক্তি-গদ্‌গদ, বিস্ময়-বিহ্বল শ্রদ্ধা-নিবেদনের ধারা আজ শুকাইয়া আসিয়াছে। আধুনিক সমালোচকেরা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির নৈর্ব্যক্তিকতার অন্তরালে তাঁহাদের মনের আনন্দ ও উত্তেজনা যথাসম্ভব চাপা দেন; যথাযথ মূল্য-নিরূপণের তাগিদে তাঁহাদের ভাষা দ্বিধাগ্রস্ত ও পরিমিত হইয়া আসিয়াছে। তাঁহাদের প্রশংসা সংশয়-কুণ্ঠিত, বিরুদ্ধবাদীর মত-খণ্ডনে অতিমাত্রায় বিব্রত; রসোপভোগের অবাধ স্বচ্ছন্দতা, ভাবপ্রকাশের অকৃপণ

অজস্রতা আজ প্রতিকূল মনোভাবের পিছুটানে বিড়ম্বিত। আর বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা-পদ্ধতির অনুকরণ-কারীর গোষ্ঠী প্রায় সম্পূর্ণরূপেই অবলুপ্ত—আজকাল তাঁহার ভাষায় কাহাকেও লিখিতে দেখি না। ভাষার সেই ঋজু, সরল বিন্যাস, প্রকাশভঙ্গীর সেই অকুণ্ঠিত তীক্ষ্ণতা ও প্রত্যক্ষ আবেদন, আবেগের জোয়ারে পালতোলা নৌকার মত, স্বচ্ছসরোবরে রাজহংসের মত সেই স্বচ্ছন্দ, সাবলীল গতি, বাঙ্গালীর মর্ম্মরস-পুষ্ট শব্দ ও ভাবের সেই সার্থক প্রয়োগ, অপ্রত্যাশিতের চমক জাগাইবার সেই স্বভাব-নৈপুণ্য, সর্বোপরি ছোট-বড, সংস্কৃত-দেশী শব্দ-যোজনার সেই অনবদ্য, অননুকরণীয় স্থাপত্য-কৌশল আধুনিক বাঙ্গলা ভাষা হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ আমাদের ভাবসম্পদ ও শব্দৈশ্বর্যেব দিক্ দিয়া অনেক দিয়াছেন, ভাষাবীণাব তারে অনেক সূক্ষ্ম মীড়-মূর্চ্ছনা লাগাইয়াছেন, কিন্তু তাঁহার ভাবধারা ও প্রকাশভঙ্গীর মধ্যে বাঙ্গালীর বৈশিষ্ট্য সার্বভৌমতার বৃহত্তর সত্তায় বিলীন হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ আমা দিগকে বিশ্বজগতের অধিবাসী করিয়াছেন, বীরবল আমাদিগকে বিদগ্ধ নাগরিক জীবনযাত্রার উপযোগী

বাগ্‌ভঙ্গিমা শিখাইয়াছেন; কিন্তু বাঙ্গালীত্বের সনাতন প্রতিষ্ঠা-ভূমিতে দাঁড়াইয়া, বাঙ্গালী জীবনের আদর্শরসে পুষ্ট হইয়া, বিশ্বজগৎকে ইহারই কেন্দ্রাভিমুখে আকর্ষণ করিয়া আর কেহ সাহিত্যরসসৃষ্টি করেন নাই। দেশের তথা গদ্য-সাহিত্যের যৌবন-শক্তি বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গেই নিঃশেষিত হইয়াছে—বঙ্কিমের পরে আমরা সমস্যামথিত, দায়িত্বপিষ্ট, কুব্জপৃষ্ঠ প্রৌঢ়ত্বে পদার্পণ করিয়াছি, এবং ইতিমধ্যেই অকালবার্দ্ধক্যের বলিরেখাও আমাদের মনে ও মানসপ্রতিবিম্ব সাহিত্যে দেখা দিয়াছে। হারানো রত্নের মত তাই বঙ্কিমের মূল্য অপরিসীম।

(২)

বঙ্কিম-সাহিত্য-আলোচনার এই স্তিমিত, নিস্তরঙ্গ অবস্থার সম্প্রতি একটি ব্যতিক্রম ঘটিতে দেখিয়া আশাতীত আনন্দ লাভ করিয়াছি। শ্রীযুক্ত অজয়চন্দ্র সরকার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে 'বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষা' নাম দিয়া একটি সঙ্কলনগ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাতে তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের বিভিন্ন উপন্যাস হইতে রূপবর্ণনামূলক কয়েকটি

অনুচ্ছেদ উদ্ধৃত করিয়া তাহাদের ভাষা-সম্বন্ধে তুলনা-মূলক আলোচনা করার চেষ্টা করিয়াছেন। সরকার মহাশয়ের প্রতিপাদ্য বিষয়টি ঠিক মৌলিকতার দাবী করিতে পারে না। বঙ্কিমের ভাষা যে প্রথম স্তরের সংস্কৃতঘেঁষা অতিরিক্ত গুরুগাম্ভীর্য পরিহার করিয়া ক্রমশঃ সহজ, সরল দেশী ভাষার বহুলতর প্রয়োগের দিকে অগ্রসর হইয়াছে, বঙ্কিম-সাহিত্যের এই সুপরিচিত সত্যটিকেই তিনি উদাহরণ-সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিযাছেন; এবং ইহারই সঙ্গে ভাষার আদর্শ-সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের অভিমত আলোচনা করিয়া তিনি দেখাইয়াছেন যে, বঙ্কিম নিজের নীতি ব্যাবহারিক ভাবে অনুসরণ করিয়াছেন। গ্রন্থকারের যুক্তি-শৃঙ্খলা ও আলোচনা-পদ্ধতির কথা পরে বলিব। তাঁহার যে গুণটি আমাকে বিশেষ আনন্দ দিয়াছে, তাহা বঙ্কিমচন্দ্র-সম্বন্ধে পুরাতন স্মৃতির পুনরুদ্ধার। গ্রন্থকার বঙ্কিমের অন্তরঙ্গ শিষ্যগোষ্ঠী-ভুক্ত সাহিত্যাচার্য অক্ষয়চন্দ্র সরকারের পুত্র; সুতরাং বঙ্কিমের প্রতি উচ্ছ্বসিত অনুরাগ তিনি হয়ত উত্তরাধিকারসূত্রেই পাইয়াছেন। যে যুগে বাংলা সাহিত্যের আকাশ-বাতাস বঙ্কিমের প্রতি

নিবিড়, একনিষ্ঠ প্রীতিতে ভরপূর ছিল, সেই অতীত হইতে প্রবহমাণ বায়ুগুলেই তিনি নিঃশ্বাস গ্রহণ করিয়াছেন। আর তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞ হইবার দ্বিতীয় কারণ এই যে, তিনি বঙ্কিমের কাব্য-মানসোদ্ভূত নায়িকা-সম্প্রদায়ের আলেখ্যপরম্পরা একই স্থানে সাজাইয়া আমাদিগকে তুলনামূলকভাবে তাহাদের রসাস্বাদনের একটি চমৎকার সুযোগ দিয়াছেন। বঙ্কিমের বিভিন্ন উপন্যাসের মালঞ্চ হইতে রমণীয় কুসুমরাজি চয়ন করিয়া তিনি যে মালা গাঁথিয়াছেন, তাহার বর্ণবৈচিত্র্য ও গন্ধের অভিনবত্ব বঙ্কিমের প্রতিভা-সম্বন্ধে আমাদিগকে নূতন করিয়া সচেতন করিয়া তোলে।

গ্রন্থকার বঙ্কিমের ভাষার পরিবর্তন দেখাইতে তাঁহার রচনাবলীকে তিনটি স্তরে বিভক্ত করিয়াছেন। তাঁহার অধিকাংশ উপন্যাসই কিন্তু প্রথম দুই স্তরেরই অন্তর্ভুক্ত—তৃতীয় স্তরের জন্য মাত্র দুইখানি উপন্যাস—'দেবী চৌধুরাণী' ও 'সীতারাম'—অবশিষ্ট আছে। উপন্যাসের অভাব পূরণ করিবার জন্য বঙ্কিমের সমালোচনা ও বিবিধ প্রবন্ধ এই তৃতীয় স্তরে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু এই

স্বরনির্দেশ সম্পূর্ণরূপে গ্রহণীয় কি না সে বিষয়ে কিছু সন্দেহের অবসর আছে। ভাষার পরিবর্তন বুঝাইতে সমজাতীয় বিষয়ের মধ্যে তুলনা করাই সমীচীন—রূপবর্ণনা ও সাহিত্য-রসবিশ্লেষণ বা যুক্তিশৃঙ্খলা-সংযোজন ঠিক একরূপ ভাষার দাবী করে না। রূপবর্ণনাতে খানিকটা কাব্যানুরঞ্জন থাকিবেই, বিচার-বিতর্কে রংএর প্রয়োগ থাকিলেও তাহার গাঢতা কিছু কম হওয়াই স্বাভাবিক। আবার উপন্যাসের ক্ষেত্রে সরল ভাষার ওজস্বিতা ও প্রকাশ-শক্তি প্রতিষ্ঠিত হইলে ভবিষ্যৎ বিভিন্ন প্রয়োজনেও এইরূপ সরলীকৃত ভাষা বহুলপরিমাণে ব্যবহৃত হইবে। তারপর উদ্দেশ্যের পার্থক্যের দ্বারাও ভাষার পার্থক্য নির্ণীত হয়। সামাজিক জীবনের নায়িকা ও ইতিহাসের নায়িকার রূপবর্ণনায় বর্ণ-প্রলেপের তারতম্য থাকিবেই। গার্হস্থ্য পরিবেশে ভাব-সৌকুমার্যের স্ফুরণ ও ঐতিহাসিক পরিমণ্ডলে চোখ-ঝলসান দীপ্তি ও উদাত্ত মহিমার দ্যোতনাই বিশেষভাবে লেখকের লক্ষ্য হইবে। আমার সেই-জন্য মনে হয় যে, 'বিষবৃক্ষ' ও 'কৃষ্ণকান্তের উইল' হইতেই বঙ্কিমের ভাষার নিগূঢ় পরিবর্তনের সূচনা।

দ্বিতীয় স্তরের সর্বশেষে সন্নিবিষ্ট 'আনন্দমঠ' ও 'রাজসিংহ' নিজ বিষয়-গৌরব ও আদর্শ-বিহারী ভাবসমুন্নতির জন্য আবার সংস্কৃতগন্ধী ভাষা-গাম্ভীর্যের আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছে। সুতরাং ঠিক কালানুক্রমিক পারম্পর্য অনুসরণ না করিয়া সমস্ত উপন্যাসকে মোটামুটি দুইটি স্তরে ভাগ করিলেই বোধ হয় স্তরবিন্যাস অধিকতর তথ্যানুসারী হইত। অবশ্য এক স্তরের মধ্যেও কাল ও লেখকের শক্তির বিকাশ-অনুসারে সংস্কৃত-পরিহার ও সহজ-প্রবর্তনের ধারায় অগ্রগতির চিহ্ন আবিষ্কার করা যাইতে পারে।

অনুচ্ছেদগুলির নির্বাচনে ও আলোচনায় শ্রীযুক্ত সরকার প্রশংসনীয় কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। ভবানন্দের দ্বারা কল্যাণীর ও গঙ্গারামের দ্বারা রমার সৌন্দর্যানুধ্যান-বর্ণনায় ভাষার পার্থক্যে যে উভয়ের প্রকৃতির পার্থক্য প্রতিবিম্বিত হইয়াছে তাহা তিনি অত্যন্ত সূক্ষ্মদর্শিতার সহিত প্রতিপন্ন করিয়াছেন। আমি তাঁহার মন্তব্যগুলি সাধারণভাবে সমর্থন করিয়া একটু নূতন দৃষ্টিভঙ্গীতে বিষয়টির বিচার করিতে চেষ্টা করিব। পূর্বেই বলিয়াছি লেখকের

উদ্দেশ্যের উপর তাঁহার রচনাভঙ্গী নির্ভরশীল। নায়িকার রূপবর্ণনার পদ্ধতি ও ভাষা ও অলঙ্কারের সংযোজনা নিয়ন্ত্রিত হয় নায়িকার প্রকৃতির যে সূক্ষ্ম বৈশিষ্ট্য লেখক ফুটাইতে চাহেন তাহার দ্বারা। যেখানে নায়িকা ইতিহাস বা রোমান্সরাজ্যের অধিবাসিনী সেখানে তাহার প্রকৃতির মধ্যে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য খুব বেশী থাকে না; সেখানে প্রতিবেশের বর্ণসমারোহ ও ঘটনার রোমাঞ্চকর অসাধারণত্ব হইতে বিচ্ছুরিত দীপ্তি নায়িকাকে মণ্ডিত করে, নিজের অন্তঃপ্রকৃতি হইতে উদ্ভাসিত জ্যোতি এই বহিঃসজ্জার উজ্জ্বলতার মধ্যে বিলীনপ্রায় হইয়া যায়। সুতরাং এই সমস্ত ক্ষেত্রে বঙ্কিম সাধারণতঃ সংস্কৃত কাব্যসাহিত্যের ঐতিহ্য অনুসরণ ও তাহারই বর্ণনাপ্রণালী ও শব্দসন্নিবেশ গ্রহণ করিয়াছেন।

(৩)

'দুর্গেশনন্দিনী'তে তিলোত্তমা, আয়েষা ও বিমলা—ইহারা একাধারে রোমান্সরাজ্যের অধিবাসিনী ও বিভিন্ন শ্রেণীর নায়িকার প্রতিনিধি। ইহাদের ক্ষেত্রে লেখক প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের

বিস্তৃত বর্ণনা দিয়াছেন এবং বর্ণনার ফাঁকে ফাঁকে উপমা ও উচ্ছ্বসিত আবেগের দ্বারা রূপের মোহময় আকর্ষণের ইঙ্গিতটি ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। এই তিন জাতীয় সৌন্দর্যের পার্থক্য ফুটাইতে হইয়াছে বলিয়া তিনি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বর্ণনার ভিতর দিয়া রূপের সমগ্রতা ও অন্তরের প্রতিফলন বুঝিতে ও বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন—এই সমগ্র দ্যোতনার দ্বারাই ইহা উচ্চাঙ্গের আর্ট হইয়াছে। ভাষা প্রধানতঃ সংস্কৃতবহুল ও সন্ধি-সমাসে দীর্ঘায়তন, কিন্তু বঙ্কিম যে গোড়া হইতেই সহজ সরল শব্দের উপযোগিতার বিষয়ে অবহিত ছিলেন তাহার প্রমাণ এখানেও মিলে।

'কপালকুণ্ডলা'য় কপালকুণ্ডলা ও মতিবিবি—উভয়ের সৌন্দর্যের ভিতর দুইটি বিভিন্ন মূলসূত্রের প্রভাব লক্ষিত হয়। উভয়ই অসাধারণ, কাজেই অসাধারণত্বের ছাপ বর্ণনার ভাষার উপরও মুদ্রিত। কপালকুণ্ডলার সৌন্দর্য প্রকৃতির সহিত একাত্ম, প্রতিবেশের সহিত এক সুরে বাঁধা ; ইহা গম্ভীর-নাদী বারিধিকূল ও অস্পষ্ট সন্ধ্যালোকের সম-গোত্রীয় ; কাজেই ভাষাতেও সাগর-কল্লোলের প্রতি-

ধ্বনি শোনা যায় এবং গোধূলির রহস্যময় অস্পষ্টতা ঘনাইয়া আসে। তাহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিশেষ উল্লেখ নাই, আছে সকলকে ছাপাইয়া, অঙ্গদ্যুতির পটভূমিকা ও পরিপূরক—অবেণীসংবদ্ধ, সর্বাঙ্গব্যাপ্ত কেশসম্ভার, আর অনির্বচনীয় মোহিনী শক্তি। মতিবিবির বর্ণনায় প্রাধান্য পাইয়াছে রূপের কূলপ্লাবী, চঞ্চল উদ্বেলতা, চক্ষুর মুহুর্মুহুঃ ভাব-পরিবর্তন, বিশেষতঃ দৃষ্টির মুগ্ধ মন্মথাবেশ, আর সমস্ত দেহভঙ্গীর মধ্য দিয়া বুদ্ধি ও আত্মগরিমার স্ফুরণ। উভয়েরই চক্ষুতে কটাক্ষ, কিন্তু উপমার দ্বারা উহার বিভিন্নতা আশ্চর্যরূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে।—মতিবিবির "লোলাপাঙ্গে ক্রূর কটাক্ষ—যেন মেঘমধ্যে বিদ্যুদ্দাম", আর কপালকুণ্ডলার স্থির, স্নিগ্ধ কটাক্ষ "সাগর-হৃদয়ে ক্রীড়াশীল চন্দ্রকিরণ-লেখার ন্যায়"।

'মৃণালিনী'তে মনোরমার রহস্যময় দ্বৈত-প্রকৃতিটির মধ্যেই তাহার বৈশিষ্ট্যের পরিচয়। প্রৌঢ়া ও বালিকার এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ তাহার বয়স্-সম্বন্ধে অনিশ্চয়তাব সৃষ্টি ও তাহার সম্বন্ধে পাঠকের বিচারবুদ্ধিকে সংশয়াচ্ছন্ন করিয়াছে।

তাহার আচরণে প্রৌঢ়ভাবের প্রাধান্য বলিয়া বঙ্কিম দাঁড়িপাল্লার সমতা-রক্ষার জন্যই যেন তাহার দেহ-সৌন্দর্যবর্ণনায় সৌকুমার্যের উপর বেশী জোর দিয়াছেন। তাহার সর্ববিধ দৈহিক ও মানসিক প্রচেষ্টা হইতে এই সুকুমার রস ক্ষরিত হইতেছে—ইহা যেন তাহার অনপচিত কৈশোরের জীবন-রসায়ন। এই দ্বৈতপ্রকৃতির বহিঃপ্রকাশরূপ তাহার দেহসৌন্দর্যে লেখক পরস্পরবিরোধী উপাদানের সমাবেশ কল্পনা করিয়াছেন—দ্বিরদরদের কোমলতা, চম্পকের কাঠিন্য, চন্দ্রকিরণের সাবয়বতা সবই এই দ্বৈতরহস্যের অনুসন্ধিৎসার দ্যোতক। আর বঙ্কিম নিপুণ চিত্রকরের ন্যায় যে বিশিষ্ট অঙ্গভঙ্গীর মধ্যে মনোরমার ছবি তুলিয়াছেন,—তাহাই তাহার সেই সাগ্রহ, সকৌতূহল প্রতীক্ষা—যেন তাহার অন্তর-রহস্যটিকে খানিকটা উদ্‌ঘাটিত করে বলিয়া লেখকের দ্বারা নির্বাচিত হইয়াছে।

'বিষবৃক্ষে' কুন্দনন্দিনী রোমান্সের নায়িকা নহে,—আমাদের গার্হস্থ্য জীবনের নবোদ্ভিন্ন-যৌবনা কিশোরী। সুতরাং তাহার রূপবর্ণনায় শব্দ বা উপমার আড়ম্বর নাই, বা সংস্কৃত কাব্যসাহিত্যের

ঐতিহ্যানুবর্তন নাই। তাহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কোন বর্ণনাই নাই। তাহার সম্বন্ধে প্রধান কথা—তাহার আত্মবিস্মৃত সরলতা ও সর্বাঙ্গীণ শান্ত-ভাব। তাহার দেহের মধ্যে কেবল তাহার বৃহৎ নীল দুইটি চক্ষুর উপর সন্ধানী আলোক নিক্ষেপ করা হইয়াছে। এই চক্ষুর মধ্যে এক অনন্যসাধারণ, অপার্থিব ভাব-মুগ্ধতা দর্শকের মনে অন্যমনস্কতা জাগায়। তাহার সৌকুমার্য বুঝাইতে 'চন্দ্রকর কি পুষ্পসৌরভকে শরীরী' করার কথা বলা হইয়াছে, কিন্তু অত্যন্ত শান্ত, নিরুচ্ছ্বাসভাবে। আর তাহার শান্ত-ভাব বুঝাইতে 'শরচ্চন্দ্রের কিরণ-সম্পাতে স্বচ্ছসরোবরের ভাব-ব্যক্তি'র উপমা প্রযুক্ত হইয়াছে। কিন্তু এই উপমাগুলির মধ্যে কবির উন্মাদনা অপেক্ষা দার্শনিকের সত্যানুসন্ধিৎসাই অধিকতর প্রকট।

ভাবোচ্ছ্বাসের এই প্রশান্তি, এই সহজ কথায় আবদ্ধ মিতভাষিতা গার্হস্থ্যজীবনে অধিষ্ঠিত সমস্ত নায়িকাবর্ণনাতেই অনুসৃত হইয়াছে। কমলা-কান্তের মনোহারিণী যুবতীর বর্ণনায় পরিহাস-রসিকতা ও খাম-খেয়ালী ভাবই নিয়ন্ত্রী শক্তি, কাব্যোচ্ছ্বাস ব্যঙ্গাত্মক মনোভাবের দ্বারা উপ-

হসিত হইয়াছে। যুবতীর পদক্ষেপে পাঁজরের হাড়ভাঙ্গার অনুভূতি বর্ণনাটিকে যেন হাস্যরসের স্তরে নামাইবার উদ্দেশ্যেই প্রযুক্ত। এখানে সহজ শব্দ-প্রয়োগ ও সংস্কৃত-রীতি-বর্জনের পিছনে এই পরিহাসকুশল মনোভাবই ক্রিয়াশীল। তেমনি 'ইন্দিরা'য় সুভাষিণীর সৌন্দর্য্য পুরুষ নহে, নারীর মুগ্ধদৃষ্টির মধ্য দিয়া অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে। কাজেই অনতিশিক্ষিতা পল্লীবালিকার মুখে যে সমস্ত কথা মানায়, যে সমস্ত উপমা তাহার ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণের মধ্যে পড়ে, সেই সবেরই দ্বারা রূপ বর্ণিত হইয়াছে। রূপের উদ্বেলতা, সমস্ত শরীরে সৌন্দর্যের একটি হিল্লোলিত প্রবাহ—মতিবিবির মধ্যেও যেমন, সুভাষিণীর মধ্যেও তেমনি দেখা যায়। কিন্তু এই সাধারণ লক্ষণগুলির প্রকাশের ভাষা দুই ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র; এবং ইহারই দ্বারা সুভাষিণীর সৌন্দর্যের মধ্যে এক অনির্বচনীয় যাদু থাকা সত্ত্বেও ইহা সাধারণ গার্হস্থ্য আবেষ্টনের সঙ্গে ঠিক মানাইয়াছে। নারীর চোখে দেখা রূপের প্রকাশ-ভঙ্গীতে পুরুষোচিত কাব্যোচ্ছ্বাস ও ভাব-বিহ্বলতা নাই।

(৪)

'চন্দ্রশেখর'-এ শৈবলিনীর বর্ণনা বঙ্কিমচন্দ্রের অনন্তসাধারণ বৈচিত্র্যসৃষ্টিকুশলতার পরিচয়। শৈবলিনী দরিদ্র গ্রাম্য বালিকা; তাহার প্রেম-রহস্যও তাহার অন্তরমধ্যে কঠোরভাবে অবরুদ্ধ। সেইজন্য নায়িকাসুলভ প্রশস্তিরচনার দ্বারা তাহার অনুপম সৌন্দর্যের প্রতি অর্ঘ্যনিবেদনের কোন স্বাভাবিক উপলক্ষ লেখক গ্রহণ করেন নাই। তাহার সুষুপ্তি-সুস্থির রূপ তপোভঙ্গের এক বিরল মুহূর্তে তাহার উদাসীন স্বামীর অতর্কিত দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। শৈবলিনীর দেহ-সংস্থিতির রেখায় রেখায় যেমন ফুটিয়া উঠিয়াছে অপরিতৃপ্তি, তেমনি বর্ণনার ছত্রে ছত্রে ফুটিয়াছে অনুতাপের বিষণ্ণ-গম্ভীর ছায়া। সুখ-স্বপ্নের প্রভাবে তাহার অধরে ঈষৎ-উদ্ভিন্ন হাসিটি যেন তাহার বঞ্চিত, ভাগ্য-বিড়ম্বিত জীবনের রহস্যটির ইঙ্গিতশংসী ম্লান দীপশিখা। তাহার জীবনের মূল সঙ্কেত, তাহার সৌন্দর্যের বিশিষ্ট আবেদন সুপ্তির আবরণে, হাসির করুণ ব্যঞ্জনায় যেন আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। বর্ণনা পড়িয়া চন্দ্র-শেখরের ন্যায় পাঠকেরও চোখে জল আসিয়া পড়ে।

'রজনী'তে লবঙ্গলতার বর্ণনায় বৈষ্ণব পদাবলীর বয়ঃসন্ধিবিষয়ক পদের প্রভাব পড়িয়াছে মনে হয়। কিশোরীর সহিত যুবতীর সৌন্দর্যের ও সৌন্দর্যানুভূতির পার্থক্যটিই ইহার বিশেষ বর্ণনীয় বস্তু। লবঙ্গলতাকে উপলক্ষ করিয়া লেখক এ বিষয়ে কিছু সাধারণ উক্তি করিয়াছেন; সুতরাং ঠিক বর্ণনাত্মক রচনার পর্যায়ে ইহা পড়ে না।

রোহিণীর সৌন্দর্যও যেন তাহার অন্তরের প্রতিচ্ছবিরূপে পরিকল্পিত। কলসীতে জল আনার সময়ে তাহার যে মন্দান্দোলিত অঙ্গভঙ্গী, পদক্ষেপের সঙ্গে সমতালে কলসীর যে ছন্দোবদ্ধ ওঠা-নামা—এ সবই যেন তাহার অন্তরের রূপতৃষ্ণার বহিঃপ্রকাশ। রোহিণীর রূপের প্রধান কথা তাহার লীলাচঞ্চল, নৃত্যশীল গতিচ্ছন্দ; তাহার অঙ্গসৌষ্ঠবের তটদেশকে বেষ্টন করিয়া আছে এই রূপ-নদীর প্রবাহ-ধর্মী চলমানতা। আর বিষধরীর সঙ্গে সাদৃশ্য-ব্যঞ্জনার জন্য বর্ণিত হইয়াছে তাহার 'কালভুজঙ্গিনীতুল্য' কবরী। বঙ্কিমের ভাষা কিরূপ অভ্রান্ত শিল্পজ্ঞানের সহিত সরল ও গুরুগম্ভীর শব্দাবলীর সমন্বয়-সাধন করিতে পারে তাহা এই বর্ণনাতেই চমৎকারভাবে

উদাহৃত হইয়াছে। "অধরে পানের রাগ, হাতে বালা, ফিতেপেড়ে-ধুতিপরা, আর কাঁধের উপর"— লিখিতে লিখিতে বঙ্কিমের অবদমিত কবি-প্রতিভা, তাঁহার ব্যঞ্জনার ঔচিত্য-বোধ জাগ্রৎ হইয়া উঠিল, এবং তিনি বাক্যটিকে শেষ করিলেন অসাধারণ শব্দাড়ম্বর ও ধ্বনিগাম্ভীর্যের মধ্যে—"চারু-বিনির্মিতা, কালভুজঙ্গিনীতুল্যা, কুণ্ডলীকৃতা, লোলায়মানা, মনোমোহিনী কবরী"। প্রতিভাবানের ভাষা যে নামতার ছক ধরিয়া চলে না, ইহা তাহার সুন্দর দৃষ্টান্ত।

(৫)

'দেবী চৌধুরাণী'তে দেবীর রূপ-পরিকল্পনায় সূক্ষ্মতর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় মিলে। এখানে কপালকুণ্ডলার ন্যায় প্রকৃতির সহিত সম্পূর্ণ একাগ্রতা নাই,— আছে নিবিড় সহানুভূতি। তাহার রূপকে উদ্বেলিত নদীর সহিত তুলনা করা হইয়াছে, কিন্তু অন্য নায়িকার সহিত পার্থক্য সূচিত হইয়াছে চঞ্চল লাবণ্যপ্রবাহের মধ্যে লাবণ্যময়ীর নির্বিকারতায়। তাহার সৌন্দর্যের বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত হইয়াছে

নদীর সহিত সমধর্মিতায় ও জ্যোৎস্নালোকে নদী-জলের মত তাহার অঙ্গ-বিন্যস্ত অলঙ্কারের মুহুর্মুহুঃ দীপ্তি-বিচ্ছুরণে। আর তাহার অন্তরের গভীর ভাবোচ্ছ্বাস, তাহার অসংবরণীয় হৃদয়াবেগ মুক্তি পাইয়াছে বীণা-ঝঙ্কৃত রাগিণী-পরম্পরার ভিতর দিয়া। রাজমহিমার সঙ্গে উদ্বেল-প্রায় প্রণয়-বেদনার অপূর্ব সমন্বয় ভাষার সাঙ্কেতিকতায় ফুটিয়া উঠিয়াছে —দেবীর জীবন-সমস্যার সংক্ষিপ্তসার তাহার এই রূপবর্ণনায় ব্যঞ্জিত হইয়াছে।

সর্বশেষ উপন্যাস 'সীতারাম'-এ অনেকগুলি রূপ-চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। এই চিত্রাঙ্কনের বিভিন্ন ধারায় উপন্যাসটির দুইটি প্রধান অঙ্গের সমতা রক্ষিত হইয়াছে। সীতারাম রাজা ও গৃহস্থ; উপন্যাসে রাজনৈতিক জীবনের প্রচণ্ড আকর্ষণে তাহার গার্হস্থ্য ও ব্যক্তিগত জীবন কি ভাবে বিপর্যস্ত হইয়াছে তাহারই বিবৃতি পাই। অনায়ত্ত বিদ্যুৎ-শিখাকে গৃহস্থালীর নিয়মিত কক্ষানুবর্তনে আবদ্ধ করিবার ব্যর্থ চেষ্টায় তাহার জীবন জ্বলিয়া পুড়িয়া ছাই হইয়াছে। রমা এই গার্হস্থ্য জীবনের ম্লান প্রদীপ; এবং শ্রী এই অনধিগম্য আদর্শলোকের বিভ্রান্তকারী

তড়িৎ-ছটা। উভয়ের সৌন্দর্য্যবর্ণনার প্রণালীও উভয়ের চরিত্রানুসারী। রমা প্যান্‌পেনে, কাঁদুনে বাঙ্গালীর মেয়ে—তাহার চোখের জল "কখনও মুষলের ধার, কখনও ইল্‌শে গুঁড়ি"। রমার প্রণয়ীও তাহার নির্জ্জন অনুধ্যানের মধ্যে তাহাকে লইয়া কবিত্ব করে না। তাহার রূপের অসাধারণত্ব তাহার আচরণের সাধারণত্বের নীচে চাপা পড়িয়া গিয়াছে। শ্রীর সিংহ-বাহিনী ও ভুবনেশ্বরী—এই উভয়মূর্ত্তির পার্থক্যটি চমৎকারভাবে পরিস্ফুট করা হইয়াছে। সিংহ-বাহিনীর আত্মবিস্মৃত উদ্দীপনার সহিত ভুবনেশ্বরীর প্রশান্ত, বিকারহীন ভাব-বিশুদ্ধির যে বৈপরীত্য তাহা কল্পনা হইতে ভাষাতে নিখুঁত-ভাবে প্রতিবিম্বিত হইয়াছে।

(৬)

বঙ্কিমচন্দ্রের আলেখ্য-প্রদর্শনীর এইখানেই শেষ। এই চিত্রশালায় সংগৃহীত চিত্রগুলির প্রত্যেকটি বর্ণসমাবেশে, চরিত্র-দ্যোতনায়, বর্ণনাভঙ্গীর বিভিন্নতায় ও বর্ণিত বিষয়ের স্বকীয়তায় অসাধারণ শিল্পকুশলতার নিদর্শন। আজকাল আমাদের

সাহিত্যে ও জীবনে সৌন্দর্য-পূজার যুগ অতীত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। রূপের অগ্নিশিখা এখন সমস্যার ভস্মাবরণে আচ্ছন্ন। যে রূপমুগ্ধতার উচ্ছ্বসিত আবেগ বঙ্কিমচন্দ্রের সৃষ্টিশক্তির প্রেরণা ছিল, তাহা তাঁহার পরবর্তীদের মনে শান্ত, সংযত ও অন্তর্গূঢ়তার লক্ষণাক্রান্ত হইয়া আসিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের নায়িকাদের দেহ-সৌন্দর্য-সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বর্ণনা পাই না—তাঁহার সুচরিতা বা কুমুদিনী যেন অন্তর-সৌকুমার্যের মূর্ত বিগ্রহ; দেহের যতটুকু আশ্রয় অন্তঃপ্রকৃতির বিকাশের জন্য অপরিহার্য, রবীন্দ্রনাথ ঠিক ততটুকুই বর্ণনা করিয়াছেন। শরৎচন্দ্রের নায়িকাদের মধ্যে যাহাদেব রূপের খ্যাতি লেখক ঘোষণা করিয়াছেন—যথা কিরণময়ী ও ষোড়শী—তাহাদের রূপের বর্ণনা শুনি না, অন্যের উপর ইহার সম্মোহন-প্রভাব, বিস্ময়-বিমূঢ় ভাব-সৃষ্টির কথাই শুনি। আজকাল সৌন্দর্যের নিগূঢ় রহস্যময় প্রকৃতির উপলব্ধির ফলেই বোধ হয় বর্ণনার প্রত্যক্ষ স্থানে পরোক্ষ রীতি প্রবর্তিত হইয়াছে। অতি-আধুনিক যুগের ঔপন্যাসিক-গোষ্ঠীর মধ্যে আদিম প্রবৃত্তির উষ্ণনিঃশ্বাসে সৌন্দর্য-

প্রতিকৃতির স্বচ্ছ নির্মলতা অস্পষ্ট ও আবিল হইয়া পড়িতেছে। মনে হয়, আমাদের মধ্যে সৌন্দর্য-আস্বাদন-বিষয়ে এক যুগান্তর-কারী রুচি-বিপ্লব সংঘটিত হইয়াছে। আমরা সূক্ষ্মের আকর্ষণে অবয়বকে ছাড়িয়াছি, আত্মার সন্ধানে দেহকে উপেক্ষা করিতে শিখিয়াছি, রূপ ও রংএর লীলাকে অন্তঃপ্রকৃতির জটিলতার জটাজালে সংহরণ করিয়াছি। এই পরিবর্তন ভালর দিকে কি মন্দর দিকে—সে প্রশ্ন এখন নাই তুলিলাম; তবে যাহা হারাইলাম, তাহা আর কোন কালে ফিরিয়া পাইব কি না সন্দেহ। বার্দ্ধক্যের দিকে দ্রুত অগ্রসরণশীল জাতিমানস আর পিছন ফিরিয়া যৌবনের প্রাণশক্তি, সৌন্দর্যানুরাগ ও আদর্শবাদ আয়ত্ত করিতে পারিবে না—ইহা একপ্রকার সুনিশ্চিত। তাই বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে এক গৌরবোজ্জ্বল যুগের অবসান ঘটিল—এই উপলব্ধি তাঁহার মহিমা-অনুভবের আনন্দকে কিয়ৎ-পরিমাণে ম্লান করিয়া দেয়। বাঙ্গালা সাহিত্য অগ্রগতির পথে নানা বন্দরে' তরী ভিড়াইবে, নানা পণ্যের আদান-প্রদানে নিজ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিবে, নানা অজানা দেশের কুহকমন্ত্রে দীক্ষা পাইবে;

কিন্তু চির-পরিচিত সৌন্দর্যের যে শ্যাম-স্নিগ্ধ উপকূল ছাড়িয়া ইহা তরঙ্গক্ষুব্ধ সমুদ্রে পাড়ি জমাইয়াছে, ইহার সুদীর্ঘ ভবিষ্যৎ জীবনে সেইরূপ আর একটি স্নেহচ্ছায়া-নিবিড় আশ্রয়স্থল ইহার মিলিবে কি? কংসনিধনে ব্রতী বাঙ্গলা সাহিত্য আর কি কোন দিন ভাব-বিভোর বৃন্দাবন-লীলায় প্রত্যাবর্তন করিবে?

ভূমিকা সুদীর্ঘ হইল। পাঠকবর্গের ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া ও সঙ্কলয়িতাকে আর একবার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়া ইহার উপসংহার করিলাম।

৩১নং সাদান এভিনিউ
কলিকাতা
২৫এ জানুয়ারি, ১৯৪৯

শ্রী শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়





বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষা

(রূপচিত্রাঙ্কন-অবলম্বনে আলোচিত)

পূর্বভাষ

এক

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস দুর্গেশনন্দিনী প্রকাশিত হয় ১৮৬৫ সালে, তিনি প্যারীচাঁদ মিত্র বা টেকচাঁদ ঠাকুরের গ্রন্থাবলি সম্পাদন করেন বা 'লুপ্তরত্নোদ্ধার' করেন ১৮৯২ সালে এবং 'সঞ্জীবনী-সুধা' বা সঞ্জীবচন্দ্রের গ্রন্থাবলি প্রকাশ করেন ১৮৯৩ সালে। ইহার পর বৎসরে তাঁহার মৃত্যু হয়। এই প্রায় ত্রিশ বৎসর ধরিয়া তিনি লেখেন নাই এমন কোন বিষয় নাই; অবশ্য নাটক তিনি লেখেন নাই, কিন্তু তাঁহার উপন্যাসগুলি নাটকীয় কথোপকথনের ভাষায় ও ভাবে ভরপূর।

এই ত্রিশ বৎসর ধরিয়া তাঁহার ভাষার গতি, ভঙ্গি, ছন্দ, শব্দবিন্যাস, লিখন-পদ্ধতি যে ঠিক একরূপই ছিল, তাহা নহে—কোন দেশের কোন লেখকেরই তাহা থাকে না, থাকিতে পারে না, থাকা সম্ভবও নহে। বয়সের ধর্ম্মে ভাষার পরিবর্ত্তন হয়, মনের গতিকে ভাষা বদ্‌লাইয়া যায়, অবস্থা- ও বিষয়-বিশেষে ভাষার রূপান্তর হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষারও বিশেষ পরিবর্ত্তন ও রূপান্তর হইয়াছিল: তাঁহার ভাষায় প্রাঞ্জলতা ও প্রসাদগুণ বাড়িয়াছিল; ভাষার মধ্যে সংস্কৃত সমাসবদ্ধ পদ কমিয়া গিয়াছিল; ভাষার মোহিনী শক্তি বর্ধিত হইয়াছিল; তান, লয় ও সুরের মাদকতা ও চিত্তবিনোদিনী শক্তির ক্রম-বিকাশ সংঘটিত হইয়াছিল,—ভাষার ছন্দ পাঠকের মন মোহিত করিয়া তাহার চিত্ত-মধ্যে স্থায়ী কর্‌করে দাগ কাটিয়া দিয়াছিল।

এইরূপ নানা ভাবে, নানান দিক্ দিয়া তাঁহার ভাষার অদল্‌বদল হইয়াছিল বটে, কিন্তু বাঙ্গালা গদ্য-সাহিত্যের ও ব্যাকরণের যেটি প্রাচীন পদ-সংস্থান-বিধি বা syntax, উহাতে তিনি কখনও হস্তক্ষেপ করেন নাই, সেটিকে স্পর্শমাত্রও করেন নাই।

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার ভাষার মধ্যে ক্রমেই অসংখ্য গ্রাম্য ও দেশজ শব্দ খাঁটি সংস্কৃত শব্দ ও সমস্ত পদের পাশে সমানে, সগৌরবে স্থান দিয়াছিলেন,—তাঁহার পূর্ববর্তী কোন লেখক যেরূপ করিতে সাহস পান নাই, অথবা গুরুচণ্ডাল-দোষ-জ্ঞানে কেহ-বা ইচ্ছা করিয়াই করেন নাই। কিন্তু এ কথা এখন বোধ হয় সর্ববাদিসম্মত যে, গ্রাম্য ও দেশজ শব্দের সমাবেশে বাঙ্গালা ভাষা অধিকতর বলবতী ও বহু প্রকার লেখন-ভঙ্গি-প্রকাশময়ী হইতে সমর্থ হইয়াছে। অপাঙ্‌ক্তেয় গ্রাম্য ও দেশজ শব্দকে জাতে তুলিয়া সংস্কৃত অভিজাতবর্গের সহিত একত্র—এক পঙ্‌ক্তিতে বসিবার আসন দিয়া বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালা ভাষার মহোপকার সাধন করিয়া গিয়াছেন। ভাষার পুনর্গঠন- ও পুষ্টি-সাধন-কল্পে বঙ্কিমচন্দ্রের ইহাই অন্যতম অক্ষয় কীর্তি।

কিন্তু তিনি প্রাদেশিক চল্‌তি ক্রিয়াপদকে কোন ক্ষেত্রেই গদ্যসাহিত্যে প্রবেশাধিকার দেন নাই—কথোপকথনের ভাষার মধ্যে দুই-এক স্থলে দুই-দশটি শব্দ ভিন্ন। মনে হয়, ভাষার সিংহদ্বারে

দণ্ডায়মান হইয়া, বৃহৎ বংশদণ্ড হস্তে, রোষ-রক্তিম নয়নে অথচ অধরোষ্ঠে ঈষৎ হাসির রেখা ফুটাইয়া তিনি যেন বলিতেছিলেন,—খবরদার! তোমার লেখ্য ভাষা শুধু তোমার নিজের প্রদেশের ভাষা নয়—সারা বাঙ্গালার ভাষা; তাই উহার মধ্যে গেলুম, গেলাম, গ্যালাম, গিয়ালাম প্রভৃতি প্রাদেশিক ক্রিয়াপদ ঢুকাইয়া, উহাকে সঙ্কীর্ণ-গণ্ডীবদ্ধ করিও না। সাবধান! —বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষা প্রাদেশিক ক্রিযাপদ-বর্জিত বলিয়াই উহা আজও সারা বাঙ্গালার ঘরে ঘরে বহুলভাবে পঠিত ও আলোচিত হইতেছে এবং সমগ্র বাঙ্গালাভাষা-ভাষীর প্রীতিলাভ করিয়াছে। যে পত্রিকার ভাষা প্রাদেশিক ক্রিয়াপদ-বর্জিত সেখানি কি অন্য যাবতীয় চুট্‌কি পত্রিকা, যেগুলির ভাষা মেয়েলি ঢঙ্গে, চটুল ছাঁদে আর গেলুম, মলুমের ধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত, সে সবগুলিব চাইতে বেশী প্রসার, প্রতিপত্তি ও জনপ্রিয়তা অর্জন করে না? সংস্কার-পন্থী' অতিপ্রবীণ 'প্রবাসী'-সম্পাদক মহাশযও ভাষার এই সংস্কার-কার্যে হাত দিতে কখনও সাহসী হন নাই।

বাঙ্গালা ভাষায় প্রাদেশিক ক্রিয়াপদের প্রয়োগ-সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র শেষ বয়সে লিখিয়াছিলেন,—

> ‘বাঙ্গালার কোন প্রদেশের লোকে বলে, “কল্লুম”, কোন প্রদেশে, “কল্লেম”, কোথাও, “কল্লাম”, কোথাও “কন্নু”। কোন প্রদেশ-বিশেষেরই ভাষা ব্যবহার করা হইবে না,—যাহা লিখিত ভাষায় চিরপ্রচলিত তাহাই ব্যবহৃত হইবে।’

বিষয়-বস্তুর গুরুত্ব ও চটুলতার উপরে ভাষার লিখন-পদ্ধতি ও শব্দ-সমাবেশ নির্ভর করে; কিন্তু এমন কোন বিষয়-বস্তু ছিল না, যাহা লইয়া বঙ্কিমচন্দ্র লেখনী চালনা করেন নাই। তাই একটিমাত্র বিষয়-বস্তু—রমণীর রূপচিত্রাঙ্কন—অবলম্বনে তাঁহার ভাষার আলোচনা করিব। রূপচিত্রগুলি প্রথম চিত্রণের কালানুক্রমে উদ্ঘাটিত করিয়া দেখাইলেই ভাষার ক্রমস্ফূরণ স্বতঃই প্রকাশমান হইবে; নতুবা বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষার সমালোচনা করিতে কলম

ধরি নাই, সে ধৃষ্টতা আমার নাই, তেমন বাতুল এখনও হই নাই।

এইরূপ চিত্র লইয়া ভাষার আলোচনা করিবার আর একটি যৎসামান্য কারণ আছে: মনে হয়, এ যুগে এ আলোচনা আমাদের তরুণ বাঙ্গালার সকলের মনের মত হইবে, তাহাদের প্রত্যেকের হৃদয়স্পর্শী হইবে,—তবেই যদি তাহারা ক্রমে বঙ্কিম-সাহিত্যের পঠন, পাঠন ও আলোচনা করিয়া নিজেরা ধন্য হইতে পারে। দেশে দেশে বঙ্কিম-উৎসব হয় বটে, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের প্রকৃত স্মৃতিপূজা হইবে তখনই যখন তরুণ বাঙ্গালা অবহিত হইয়া, শ্রদ্ধান্বিতভাবে মহাভারত-সম বঙ্কিম-সাহিত্যের অধ্যয়ন করিয়া এবং তাঁহার অমৃতোপম উপদেশাবলি পালন করিয়া তাঁহারই নিরূপিত পথে জীবনযাত্রা পরিচালনা করিতে প্রকৃতই যত্নবান্ হইবে।

'যে দিন মার সকল সন্তান মাকে মা বলিয়া ডাকিবে, সেই দিন উনি প্রসন্ন হইবেন।'

দুই

বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্বে বাঙ্গালা গদ্যের রূপটি কেমন ছিল, তাহা তাঁহার নিজের ভাষায় বলিতেছি।—

'প্রাচীন কালে, অর্থাৎ এ দেশে মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত হইবার পূর্বে, বাঙ্গালায় সচরাচর পুস্তক-রচনা সংস্কৃতের ন্যায় পদ্যেই হইত। গদ্য-রচনা যে ছিল না, এমন কথা বলা যায় না; কেন-না হস্ত-লিখিত গদ্য-গ্রন্থের কথা শুনা যায়। সে সকল গ্রন্থও এখন প্রচলিত নাই, সুতরাং তাহাদের ভাষা কিরূপ ছিল, তাহা এক্ষণে বলা যায় না। মুদ্রাযন্ত্র সংস্থাপিত হইলে, গদ্য-বাঙ্গালা-গ্রন্থ প্রথম প্রচারিত হইতে আরম্ভ হইল। প্রবাদ আছে যে, রাজা রামমোহন রায় সে সময়ের প্রথম গদ্য-লেখক। তাঁহার পরে যে গদ্যের সৃষ্টি হইল, তাহা লৌকিক বাঙ্গালা ভাষা হইতে সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন। এমন কি,

বাঙ্গালা ভাষা দুইটি স্বতন্ত্র বা ভিন্ন ভাষায় পরিণত হইয়াছিল: একটির নাম সাধুভাষা অর্থাৎ সাধুজনের ব্যবহার্য ভাষা, আর একটির নাম অপর ভাষা অর্থাৎ সাধু-ভিন্ন অপর ব্যক্তিদিগের ব্যবহার্য ভাষা। এ স্থলে সাধু অর্থে পণ্ডিত বুঝিতে হইবে। আমি নিজে বাল্যকালে ভট্টাচার্য অধ্যাপকদিগকে যে ভাষায় কথোপকথন করিতে শুনিয়াছি, তাহা সংস্কৃত-ব্যবসায়ী ভিন্ন অন্য কেহই ভাল বুঝিতে পারিতেন না। তাঁহারা কদাচ "খয়ের" বলিতেন না—"খদির" বলিতেন; কদাচ "চিনি" বলিতেন না—"শর্করা" বলিতেন। "ঘি" বলিলে তাঁহাদের রসনা অশুদ্ধ হইত, "আজ্য"ই বলিতেন,—কদাচিৎ কেহ ঘৃতে নামিতেন। "চুল" বলা হইবে না,—"কেশ" বলিতে হইবে। "কলা" বলা

হইবে না,—"রম্ভা" বলিতে হইবে। ফলাহারে বসিয়া "দই" চাহিবার সময় "দধি" বলিয়া চীৎকার করিতে হইবে। আমি দেখিয়াছি, একজন অধ্যাপক একদিন "শিশুমার" ভিন্ন "শুশুক" শব্দ মুখে আনিবেন না, শ্রোতারাও কেহ শিশুমার অর্থ জানে না, সুতরাং অধ্যাপক মহাশয় কি বলিতেছেন, তাহার অর্থবোধ লইয়া অতিশয় গণ্ডগোল পড়িয়া গিয়াছিল। পণ্ডিতদিগের কথোপকথনের ভাষাই যেখানে এইরূপ ছিল, তবে তাঁহাদের লিখিত বাঙ্গালা ভাষা আরও কি ভয়ঙ্কর ছিল, তাহা বলা বাহুল্য। এরূপ ভাষায় কোন গ্রন্থ প্রণীত হইলে, তাহা তখনই বিলুপ্ত হইত, কেন-না কেহ তাহা পড়িত না। কাজেই বাঙ্গালা সাহিত্যের কোন শ্রীবৃদ্ধি হইত না।'

বঙ্কিমচন্দ্র আরও লিখিয়াছেন,—

'বাঙ্গালা ভাষার এক সীমায় তারাশঙ্করের কাদম্বরীর অনুবাদ, আর এক সীমায় প্যারীচাঁদ মিত্রের "আলালের ঘরের দুলাল"। ইহার কেহই আদর্শ ভাষায় রচিত নয়। কিন্তু আলালের ঘরের দুলালের পর হইতে বাঙ্গালী লেখক জানিতে পারিল যে, এই উভয় জাতীয় ভাষার উপযুক্ত সমাবেশ-দ্বারা এবং বিষয়ভেদে একের প্রবলতা ও অপরের অল্পতা-দ্বারা আদর্শ বাঙ্গালা গদ্যে উপস্থিত হওয়া যায়।'

ইহাই বঙ্কিমচন্দ্রের শেষ জীবনে, ১৮৯২ সালে, লিখিত রচনার নমুনা—লুপ্তরত্নোদ্ধারের ভূমিকায় লিপিবদ্ধ হইয়াছিল।

আমি তারাশঙ্করের কাদম্বরী-সম্পাদন-সময়ে 'গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের পরিচয়' শীর্ষক ভূমিকায় লিখিয়াছি,—বঙ্কিমচন্দ্রের এই বিধান-অনুযায়ী

'আদর্শ' গদ্যই তাঁহার নিজের গদ্য-রচনা। তিনিই সর্বপ্রথম তাঁহারই নির্দেশিত উভয় জাতীয় ভাষার উপযুক্ত সমাবেশ তাঁহারই রচনায় অনুষ্ঠিত করিয়াছেন এবং বিষয়-ভেদে, বিষয়ের গুরুত্ব-হিসাবে—একের প্রবলতা ও অপরের অল্পতা তিনিই তাঁহার বিভিন্ন রচনা-মধ্যে সন্নিবেশিত করিয়াছেন।

তিন

পিতৃদেব বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষার আলোচনা-প্রসঙ্গে লুপ্তরত্নোদ্ধারের পূর্ব-লিখিত উক্তিটি উদ্ধার করিয়া 'পিতাপুত্র'-এ লিখিয়াছেন,—

'দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা লিখিবার সময় বঙ্কিমবাবু যে সম্যক্ প্রকারে এই সত্য উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন, এমন আমার বোধ হয় না। তাঁহার ভাষার "লম্ফত্যাগ", "নিদ্রাগমন" প্রভৃতি সমস্ত পদ লইয়া কায়স্থকুলভূষণ রাজেন্দ্রলাল মিত্র বিবিধার্থ-সংগ্রহে বিদ্রূপাত্মিকা সমালোচনা করিয়াছিলেন, আর কায়স্থকুলাধম আমি ভাষার একান্ত সংস্কৃতানুসারিণী ভঙ্গি লইয়া বঙ্কিমবাবুর সহিত বিচার-বিতর্ক করিয়াছি। .. .. আমরা বুঝি

ধর্মকার্যে, প্রত্নতত্ত্বে, ছটা-ছন্দোবিভূষিত কবিতায়, সেই কবিতার লালিত্যে ও মাধুর্যে সংস্কৃতের প্রয়োজন। সংস্কৃত আমাদের গুরুজন; কিন্তু গুরুজন লইয়া ত সংসার হয় না। প্রধানত পুত্র-কলত্র, দাসদাসী, বন্ধুবান্ধব—এই সকল লইয়াই সংসার। এ সকল ত সংস্কৃত নয়—প্রাকৃত। তাই বলিয়া কেবল বিষয়কার্যের জন্য প্রাকৃত বা বাঙ্গালার প্রয়োজন, এমন নহে। জীবন্ত কাব্যের বাঙ্গালাই জান্ অর্থাৎ প্রাণ।

'যে কবিতা বুকের ভিতর দিয়া হৃদয়ে বসিয়া যায়, তাহা বাঙ্গালির পক্ষে বাঙ্গালাতেই হওয়া সম্ভব। সাধারণ বর্ণনায়, সাধারণ কথায় যেমন ভাব পরিস্ফুট হয়, ভাষা সংস্কৃতানুসারিণী হইলে তেমন হয় না। এইরূপ কথার বিচার-বিতর্ক অনেক দিন চলিল (বহরমপুরে)। বঙ্কিমবাবু বিষবৃক্ষে "গোরু ঠেঙ্গাইতে" লাগিলেন। বিষবৃক্ষে উভয়রূপ ভাষার সমাবেশ হইল। তখন বিষবৃক্ষ হাতের লেখায়,—ছাপানো হয় নাই।

'মধ্যবর্তিনী ভাষা-প্রচারের সূচনা হইতেই "বঙ্গদর্শন"-প্রচারের সূচনা আরম্ভ হইল।'

সকলেই জানেন, এই বিষবৃক্ষের তলায় গোরু ঠেঙ্গাইতে ঠেঙ্গাইতে পাচন-বাড়ি-হাতে বঙ্গে বঙ্গ-দর্শনের আবির্ভাব ১৮৭২ সালে। ইতিপূর্বে যথাক্রমে দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা ও মৃণালিনী প্রকাশিত হইয়াছিল। বঙ্গদর্শনের ভাষা বঙ্কিমচন্দ্রের নিজের মতে ও বিধানে 'আদর্শ মধ্যবর্ত্তিনী' ভাষা—সংস্কৃত ও দেশজ শব্দের অপূর্ব সমাবেশে অভিনব হৃদয়-গ্রাহিণী ভাষা। এই সংস্কৃত ও দেশীয় ভাষার অর্থাৎ বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় সাধু ও অপর ভাষার মধ্যগা ভাষা বঙ্কিমচন্দ্রের অন্যতম অমর কীর্ত্তি। স্মরণ রাখিতে হইবে, এই বঙ্গদর্শনেই বিষয়ভেদে ভাষার কসরত্ ও কারচুপি দেখাইয়া বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গবাসীকে বিস্ময়বিমুগ্ধ ও অবাক্ করিয়া গিয়াছেন।

কিন্তু রূপবর্ণনা উদ্ধার করিয়া ভাষার আলোচনা করিবার অগ্রে আমাকে বিষবৃক্ষের আদর্শ-ভাষা হইতে 'গোরু ঠেঙ্গানো' দেখাইতে হইতেছে।—

'নগেন্দ্র দেখিতে দেখিতে গেলেন, নদীর জল অবিরল চল্‌চল চলিতেছে—ছুটিতেছে—বাতাসে নাচিতেছে—রৌদ্রে

হাসিতেছে—আবর্তে ডাকিতেছে। জল অশ্রান্ত—অনন্ত—ক্রীড়াময়। জলের ধারে, তীরে তীরে, মাঠে মাঠে রাখালেরা গোরু চরাইতেছে, কেহ-বা বৃক্ষের তলায় বসিয়া গান করিতেছে, কেহ-বা তামাকু খাইতেছে, কেহ-বা মারামারি করিতেছে, কেহ কেহ ভুজা খাইতেছে। কৃষকে লাঙ্গল চষিতেছে, গোরু ঠেঙ্গাইতেছে, গোরুকে মানুষের অধিক করিয়া গালি দিতেছে।'

বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষা-প্রসঙ্গে পিতৃদেব অন্যত্র লিখিয়াছেন,—

'তাহার পরের যুগের প্রবর্ত্তক, প্রতিষ্ঠাতা, পরিচালক—সম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্র। তিনি কালীপ্রসন্নের, প্যারীচাঁদের গ্রাম্যতা-দোষ পরিহার-পূর্বক ভাষাকে একটু বিশুদ্ধ করিয়া তাহার প্রবাহ বৃদ্ধি করিলেন। সেই পথে বাঙ্গালা ভাষা এখনও চলিতেছে এবং

সেই পন্থাই বাঙ্গালার সমগ্র সাহিত্যসেবীর অনুমোদিত।'.........

'ভাষাকে জীবন্ত রাখিতে হইলে, তাহা জন-সাধারণের বোধগম্য করা আবশ্যক; আর ভাষাকে সুন্দর করিতে হইলে, তাহাতে রস-সংযোগ করা আবশ্যক। রসময়ী ভাষাই সাহিত্যের আধার।'

বঙ্কিমচন্দ্র এই জীবন্ত রসময়ী ভাষা তথা সাহিত্যের সম্রাট্। কথিত ভাষার সমাবেশে লিখিত ভাষাকে প্রাণবন্ত করিতে এবং রস-সংযোগে সেই ভাষাকে রসময়ী করিতে তিনি অদ্বিতীয়, আর তিনিই এই বিষয়ের প্রথম পথপ্রদর্শক। ইহাও বঙ্কিমচন্দ্রের অন্যতম প্রধান কীর্তি। একবার লিখিয়াছিলাম, বঙ্কিমচন্দ্র জন্মগ্রহণ না করিলে আমরা আজ বাঙ্গালি বলিয়া পরিচয় দিতে লজ্জিত হইতাম।

চার

দুর্গেশনন্দিনীর প্রকাশ-সম্বন্ধে শিবনাথ শাস্ত্রী লিখিয়াছেন,—

'আমরা সে দিনের কথা ভুলিব না। দুর্গেশ-নন্দিনী বঙ্গসমাজে পদার্পণ করিবামাত্র সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। এ জাতীয় উপন্যাস বাঙ্গালাতে কেহ অগ্রে দেখে নাই। আমরা তৎপূর্বে বিজয়-বসন্ত, কামিনী-কুমার প্রভৃতি কতিপয় সেকেলে কাদম্বরী-ধরণের উপন্যাস, গার্হস্থ্য-পুস্তক-প্রচার-সভার প্রকাশিত হংসরূপী রাজপুত্র, চকমকির বাক্স প্রভৃতি কয়েকটি ছোট গল্প এবং আরব্য উপন্যাস প্রভৃতি কয়েকখানি উপকথা-গ্রন্থ আগ্রহের সহিত পড়িয়া আসিতেছিলাম। আলালের ঘরের দুলাল তাহার মধ্যে একটু নূতন ভাব আনিয়াছিল। কিন্তু দুর্গেশনন্দিনীতে আমরা যাহা দেখিলাম তাহা অগ্রে কখনও দেখি নাই। এরূপ অদ্ভুত চিত্রণ-শক্তি বাঙ্গালাতে কেহ অগ্রে দেখে নাই, দেখিয়া সকলে চমকিয়া উঠিল। কি বর্ণনার রীতি, কি ভাষার নবীনতা,—সকল বিষয়ে বোধ হইল যেন বঙ্কিমবাবু দেশের লোকের রুচি ও প্রবৃত্তির স্রোত পরিবর্তিত করিবার জন্য প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়া লেখনী ধারণ করিয়াছেন।'

সকলে জানেন কিনা বলিতে পারি না, কিন্তু

পিতৃদেবের মুখে শুনিয়াছি যে, দুর্গেশনন্দিনীর প্রকাশে 'ভট্টাচার্য-অধ্যাপক'-মহলে হুলুস্থূল পড়িয়া গেল। কাঁটালপাড়ার চাটুয্যে-বাড়ীর ডেপুটীর পুত্র, ডেপুটী বঙ্কিমের নাম পার্শ্ববর্তী পল্লী ভাটপাড়ার প্রবীণ ভট্টাচার্যগণের অনেকেরই জানা ছিল। তাঁহারা শুনিলেন, শ্রীমান্ বঙ্কিম একখানি উপন্যাস লিখিয়াছে। এমন বই আর হয় না! একখানি পুস্তক আনাইয়া মহামহাপণ্ডিতেরা অত্যন্ত আগ্রহের সহিত পড়িতে আরম্ভ করিলেন। পুস্তকের গোড়াতেই তাঁহারা পড়িলেন,—

> '৯৯৭ বঙ্গাব্দের নিদাঘশেষে একদিন একজন অশ্বারোহী পুরুষ বিষ্ণুপুর হইতে মান্দারণের পথে একাকী গমন করিতে-ছিলেন। দিনমণি অস্তাচল-গমনোদ্যোগী দেখিয়া অশ্বারোহী দ্রুতবেগে অশ্ব-সঞ্চালন করিতে লাগিলেন।'

পণ্ডিতেরা সুর করিয়া বহুবার এই দুইটি বাক্য পাঠ করিলেন, কিন্তু যখন দেখিলেন, লেখার মধ্যে

কোথাও কোন পদে মিল নাই—রচনা পয়ার বা অন্য কোন ছন্দে রচিত নয়, তখন তাঁহারা অতিশয় বিরক্ত ও ক্ষুণ্ণ হইলেন এবং একটা অশ্লীল অথচ খাঁটি সংস্কৃত সমস্ত পদ সমস্বরে ও উচ্চকণ্ঠে উচ্চারণ করিয়া পুস্তকখানি দূরে ফেলিয়া দিলেন—আর তৃতীয় বাক্যে অগ্রসর হইবার তাঁহাদের প্রবৃত্তি হইল না। যে গ্রন্থ ছন্দোবদ্ধ নয়, সে গ্রন্থ আবার গ্রন্থ! সকলের কণ্ঠে ইহার এতাদৃশী সুখ্যাতি!—যত সব মূর্খ, অপোগণ্ড, অর্বাচীনের দল!

যে 'সাধু' বা পণ্ডিতদের মুখ চাহিয়া বঙ্কিমচন্দ্র দুরূহ সংস্কৃত সমাসবহুল ভাষায় তাঁহার প্রথম পুস্তক রচনা করিলেন, তাঁহারই গ্রহবৈগুণ্যে সেই পণ্ডিত-সমাজই তাঁহাকে শাপ দিতে আরম্ভ করিলেন—তাঁহার অপরাধ—তিনি অত বড় একখানা গ্রন্থ লিখিলেন কিনা গদ্যে—গদ্যে কোনও উৎকৃষ্ট গ্রন্থ লেখা যায় না কি? ইহা বঙ্কিমের অর্বাচীনতা ও মূর্খতার পরিচায়ক—ইহা সম্পূর্ণ পণ্ডশ্রম।

পাঁচ

এই সাধুগণকে দলে ভিড়াইতে বঙ্কিমচন্দ্রকে অনেক কাঠখড় পোড়াইতে হইয়াছিল। এই সাধুর দলই আর একবার তাঁহার উপর খড়্গহস্ত হইয়া অজস্রধারায় গালিবর্ষণ করিয়াছিলেন,—ছয়-সাত বর্ষ পরে বিষবৃক্ষের অঙ্কুর সযত্নে বক্ষে লইয়া যখন বঙ্গে বঙ্গদর্শন দেখা দিল—যখন বঙ্গদর্শন গুরুচণ্ডাল-দোষের প্রতি অঙ্গুষ্ঠ-প্রদর্শনপূর্বক সংস্কৃতের দুই পার্শ্বে দেশজ ও বিদেশজ বাঙ্গালা শব্দকে উহার প্রতি পঙ্‌ক্তিতে সমাবেশ করিল। সাধুর দল এবার ভাষার জাতিপাতে অগ্নিশর্মা হইয়া উঠিলেন। হায়। হায়! এতদিনে নাস্তিক, ম্লেচ্ছ বঙ্কিমের হস্তে ভাষাজননীর পিণ্ডান্ত-পিণ্ডশেষ হইল—সব গেল! মহাভারত অশুদ্ধ হইল! গোদুগ্ধে গোমূত্র সংমিশ্রিত হইল!

শিবনাথ শাস্ত্রী আরও লিখিয়াছেন,—

'বঙ্কিমবাবু স্বপ্রণীত গ্রন্থসকলে এক নূতন বাঙ্গালা গদ্য লিখিবার পদ্ধতি অবলম্বন করিলেন; তাহা এক দিকে বিদ্যাসাগরী ও অক্ষয়ী ভাষা এবং

অপর দিকে আলালী ভাষার মধ্যগা। ইহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া আমার পূজ্যপাদ মাতুল দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয় তাঁহার সম্পাদিত সোমপ্রকাশে বঙ্কিমবাবু ও তাঁহার অনুকরণকারীদিগের নাম "শবপোড়া-মড়াদাহের দল" রাখিলেন। অভিপ্রায় এই, যাহারা "শব" বলে তাহারা "দাহ" বলে,—যাহারা "মড়া" বলে তাহারা তৎসঙ্গে "পোড়া" বলে, কেহই "শবপোড়া" বা "মড়াদাহ" বলে না। তাঁহার মতে বঙ্কিমী দল ঐরূপ ভাষা-ব্যবহার-দোষে দোষী। আমরা সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদল (সাধুর দল) সোমপ্রকাশের পক্ষাবলম্বন করিলাম এবং বঙ্কিমী দলকে "শবপোড়া-মড়াদাহের দল" বলিয়া বিদ্রূপ করিতে আরম্ভ করিলাম। বঙ্কিমের দল ছাড়িবেন কেন? তাঁহারা সোমপ্রকাশের ভাষাকে "ভট্টাচার্যের চাণা" নাম দিয়া বিদ্রূপ করিতে লাগিলেন।'

শাস্ত্রী মহাশয়ের শেষের উক্তিটি সত্য নহে। পিতৃদেব 'পিতাপুত্র'-এ লিখিয়াছেন,—

'সাধারণীতে "চেণাচুর" নাম দিয়া, পাঠককে বালক সাজাইয়া, মুঠা মুঠা বিদ্রূপ বর্ষণ করিতাম।

সাধারণীর চেণাচুর একটা উপমার সামগ্রী হইয়া উঠিয়াছিল। সাহিত্যে, সংবাদপত্রে সাধারণীর চেণাচুরের উল্লেখ থাকিত। "কিষণ দাস-কি চেণা —তের রূপেয়া চার আনা—বড়লোক লেতেহেঁ, বড়লোক খাতেহেঁ" ইত্যাদি কথা তখন লোকের মুখে মুখে শুনা যাইত। চেণাচুর ছেলেরাই খায়,— সাধারণীর চেণাচুর বুড়ারাও ফোক্‌লা দাঁতে চিবাইতে লাগিলেন।'

৫ই জুলাই, ১৮৭৪ সালের 'সাধারণী'তে (তখন যুগলাঙ্গুরীয় ও ইন্দিরা শেষ হইয়াছে এবং চন্দ্রশেখর আরম্ভ হইয়াছে;) পিতৃদেব এই "চণকচূর্ণ" অভিধেয় ধারাবাহিক রসসাহিত্য-সম্ভার-মধ্যে তৎকাল-প্রচলিত হিন্দু পেট্রিয়ট, অমৃতবাজার পত্রিকা, ইণ্ডিয়ান মিরার, স্থলভ সমাচার, সোম-প্রকাশ, ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া, ওরিয়্যাণ্টাল অব্‌জার্‌ভার, এমন কি নিজের সাধারণী পত্রিকাকে লইয়া ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপ করিয়াছিলেন। সকল পত্রিকাকেই 'চেণা' অর্থাৎ চণকচূর্ণ বা চেণাচুর বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন, যেমন—'পৈলা নম্বর—কিষণ দা-আস-কি চেণা···দুস্‌রা নম্বর বাগ্‌বাজার-কি চেণাচুর····'

ইত্যাদি। সোমপ্রকাশের উদ্দেশে লিখিত হইয়াছিল,—

'ভট্টাচার্য-কি চেণা সোমবারকো লেনা। এস্মে প্রা-আ-আড্-বিবাক হ্যায়, মলিম্লুচ হ্যায়, [মলিম্লুচ অর্থে চোর। প্রাড্বিবাক (বিচাবক) ও মলিম্লুচ শব্দ সংস্কৃত ব্যাকরণে উদাহরণ-স্বরূপ একত্র ব্যবহৃত হইয়াছে। সোমপ্রকাশে উৎকট সংস্কৃত-বহুল শব্দ ব্যবহৃত হইত।] সহা-আ-আনুভূতি হ্যায়, উদূখল হ্যায, ধৃষ্টদ্যুম্ন হ্যায়। ইয় সব মিল্ কব্ ভট্টাচার্য-কি চেণা বনায়া হুয়া হ্যায়। ইস্মে ইষ্ট, নিষ্ঠ, শিষ্ট, কৃষ্ণ,—রাজনীতি, সমাজনীতি, ভ্রাতৃপ্রীতি,—সংবাদ, বিসংবাদ, বাদানুবাদ, অপবাদ—সব ভাজাভাজা, তাজাবতাজা মিলেগা। ভট্টাচার্য-কি চেণা সোম বারকো লেনা।'

বলিয়াছি, সেবারকার 'চণকচূর্ণ' তৎকাল-প্রচলিত সকল প্রধান প্রধান সংবাদপত্রের উপর লিখিত হইয়াছিল। তাহা হইলে বলা যায় কি যে, 'তাঁহারা (বঙ্কিমের দল) সোমপ্রকাশের ভাষাকে "ভট্টাচার্যের চাণা" নাম দিয়া বিদ্রূপ করিতে লাগিলেন?' সোমপ্রকাশ ও উঁহার দলভুক্ত

লোকেরা অর্থাৎ 'সাধুরা' বঙ্কিমী ভাষা লইয়া সময়ে-অসময়ে যখন-তখন ঠাট্টাবিদ্রূপ করিতেন বটে, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র তথা তাঁহার দলের লোকেরা সে সকল ঠাট্টাতামাসায় ভ্রূপেক্ষও করিতেন না—পাণ্টা জবাব দেওয়া ত দূরের কথা। অত বড় নির্ভীক, তেজস্বী ও আত্মসম্মান-সম্পন্ন সাহিত্যিক সম্প্রদায় আর হয় নাই, কখনও হইবে বলিয়া মনে হয় না।

তবে ইহাও অবশ্য স্বীকার্য যে, বঙ্কিমচন্দ্রের দলেব সাহিত্যসেবীরা সুযোগ পাইলে এই সাধু পণ্ডিতি-দলের লোকেদেব ছাড়িয়া দিতেন না—তাঁহাদের পণ্ডিতি ভাষার উল্লেখ করিয়া একটু-আধটু ঠোকব দিতে ভুলিতেন না। একটি উদাহরণ দিতেছি।

পিতৃদেব 'পিতাপুত্র'-এ সাধারণীর প্রকাশ-প্রসঙ্গে ১৯০৪ সালে লিখিয়াছিলেন,—

'বঙ্কিমবাবুর বঙ্গদর্শনের গুণে বাঙ্গালি সক করিয়া বাঙ্গালা পডিতে শিক্ষা করেন, আর রাজনীতি-জড়িত সাহিত্যের সক মিটাইবার জন্য সাধারণীব জন্ম। পূর্বেই বলিয়াছি, ১২৭৯ সালের ১লা বৈশাখ বঙ্গদর্শন, আর দেড় বৎসর পরে ১২৮০

সালের ১১ই কার্তিক সাধারণী প্রকাশিত হয়। তাহার পূর্বে রাজনীতির সহিত সাহিত্যের সেবা কি আর কোন সংবাদপত্রে হইত না? হইত বৈকি। ঈশ্বর গুপ্ত লিখিতেন লাট সাহেবকে সম্বোধন করিয়া পদ্য; কিন্তু সাধারণী-প্রকাশের সময় সেরূপ কিছু ছিল না। ছিল মহামহিমান্বিত সোমপ্রকাশ। তাহাতে থাকিত (বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের প্রেতাত্মা ক্ষমা করিবেন।) তাহাতে থাকিত—'যদি রাজস্বসচিবের অবিমৃষ্যকারিতা-দোষে দেশীয় জনগণের উপচীয়মান গুণাবলি অপচিত হইতে থাকে"—এই সাহিত্য-রচনা সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতবর্গের আদরের সামগ্রী হইলেও, ইংরাজী কৃতবিদ্যগণ ইহাতে অবজ্ঞা প্রদর্শন করিতেন, সাধারণ জনগণ উহার ত্রিসীমানাতেই অগ্রসর হইতে পারিত না।'

ভাষার স্তর-বিভাগ

ছয়

এইবার একটি বিশেষ প্রসঙ্গের অবতারণা করিতে হইতেছে। বলিয়াছি, ১৮৬৫ সাল হইতে আরম্ভ করিয়া প্রায় ত্রিশ বৎসর যাবৎ বঙ্কিমচন্দ্র জোর-কলমে বঙ্গসাহিত্যের পুষ্টি- ও শ্রীবৃদ্ধি-সাধন করিয়াছিলেন। কিঞ্চিৎ অধিক এই পাদশতক কালকে, তাঁহার ভাষার দিক্ হইতে তিন ভাগে ভাগ করিতে চাই। এইরূপভাবে ভাগ করিয়া লইলে তাঁহার ভাষার ক্রমবিকাশ ও ক্রমশঃ বর্ধমান স্ফুরণ বুঝিবার পক্ষে নিশ্চয়ই অনেক সুবিধা হইবে।

১৮৬৫ হইতে ১৮৭২—৮ বৎসর,
প্রথম ক্রম বা স্তর;

১৮৭২ হইতে ১৮৮২—১০ বৎসর,
দ্বিতীয় ক্রম বা স্তর;

১৮৮২ হইতে ১৮৯৩—১১ বৎসর,
তৃতীয় ক্রম বা স্তর।

পূর্বেই বলা হইয়াছে, ১৮৭২ সালে বঙ্গদর্শন তথা বিষবৃক্ষের প্রকাশ হইতে বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষার বিশেষ পরিবর্তন হয়,—সংস্কৃতের সঙ্গে সঙ্গে উহার আশেপাশে প্রাকৃত, দেশজ এবং খাঁটি বাঙ্গালা চল্‌তি পদের ভূরি-ভূরি প্রয়োগে ভাষা আরও সহজ, সরল, মিষ্ট, মধুর হইয়া উঠে,—সংস্কৃত-না-জানা পাঠকের পক্ষে তাঁহার রচনা পড়িয়া রসগ্রহণ ও শিক্ষালাভ করা খুবই সহজ ও অনায়াস-সাধ্য হইয়া দাঁড়ায়।

বঙ্গদর্শন-প্রকাশের প্রধান উদ্দেশ্যই লোক-শিক্ষা, কাজেই বাধ্য হইয়া বঙ্কিমচন্দ্রকে তাঁহার ভাষা আরও প্রাঞ্জল ও মনোরম করিতে হইয়াছিল; ভাষার মধ্যে সংস্কৃতের লম্বা-লম্বা সমস্ত পদ কমাইয়া দিয়া, সেগুলির স্থানে অসংস্কৃতজ্ঞ সাধারণ বা ‘অপর’ লোকের জানা এবং তাহাদের কথাবার্তায় বহুল-ব্যবহৃত রাশি রাশি শব্দ ও পদকে সাদরে আসন দিয়া তিনি ভাষাকে জনসাধারণের অনায়াসবোধ্য ও হৃদয়গ্রাহী করিয়াছিলেন।

সাত

এই দ্বিতীয় স্তর-সম্বন্ধে ১৮৮৩ সালে, অর্থাৎ আনন্দমঠ প্রকাশিত হইবার পরে, পিতৃদেব ‘সাধারণী’তে লিখিয়াছিলেন,—

‘সংস্কৃত-নন্দিনী সাধু বাঙ্গালার মৃদঙ্গ-ঢক্কায়, দম্ভ-দুন্দুভিতে বাঙ্গালার আসর শব্দিত হইতেছিল; একটু বিরামের অবসরে টেকচাঁদ একবার রাখাল-বাঁশীতে মেঠোস্বরে একটি ক্ষীণ তান ধরিলেন, সাধারণ শ্রোতৃবর্গ ব্যথার ব্যথী পাইয়া করতালি দিল, জয়ধ্বনি করিল; ওস্তাদেরা সাবেক স্বরের সহিত স্বর মিলিল না বলিয়া মুখ বাঁকাইয়া, নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া উঠিয়া গেলেন।

‘তাহার পর বঙ্কিমবাবু আসরে উপস্থিত হইলেন, —ভবভূতি-কালিদাসের মৃদঙ্গ-বীণার স্বর নামাইয়া, স্কট্-বুলরের বেহালা-সারেঙ্গে দেশী তন্ত্র চড়াইয়া বাঙ্গালির সেই বংশীরবে স্বর বাঁধিলেন। স্বর লাগিলে পর দশজনে মিলিয়া বঙ্গদর্শনের কথকতা আরম্ভ হইল। কখন গভীর অধ্যাত্মতত্ত্বের গভীর কথায় শ্রোতারা ইহকাল-পরকালের চিন্তায় চিন্তিত, কখন-বা করুণ রসের দ্রাবিণী ভাষায় তাহাদের হৃদয়

প্লাবিত; কখন কাণ পাতিয়া উপদেশ শুনিতেছে, কখন বা রহস্যরসের হাস্য করিতেছে। বঙ্গদর্শনের এই কথকতায় বালক শিখিল, যুবক শিখিল; বয়স্ক পল্লীবাসী একবার কাশীদাস-কৃত্তিবাসকে স্মরণ করিয়া পরস্পরের মুখাবলোকন করিলেন; ইংরাজী-নবীশ বিস্মিত হইলেন,—তরুণী তাস ফেলিয়া পড়িতে বসিলেন। বাঙ্গালার উপর বাঙ্গালির আদর হইল। (আধুনিক বাঙ্গালা ভাষায়) এইটি চতুর্থ বিপ্লব।'

আট

এই সকল কারণে ১৮৭২ সালে দ্বিতীয় স্তরের সূচনা ধরা হইল। এই দ্বিতীয় স্তর শেষ হইয়াছে ১৮৮২ সালে রাজসিংহের আবির্ভাবে, আর তৃতীয় বা শেষ বা শ্রেষ্ঠ স্তরের সূচনা সেই ১৮৮২ সালেই দেবী চৌধুরাণীর শুভাগমনে।

রাজসিংহের ভাষা আর দেবী চৌধুরাণীর ভাষা পরস্পর তুলনা করিলে, এমন কি উভয় পুস্তক পর পর পাঠ করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, রাজসিংহে একটি স্তর শেষ হইয়া গিয়া দেবী চৌধুরাণীতে অন্য

একটি অভিনব ক্রম বা স্তরের আরম্ভ হইয়াছে। তুলনার সুবিধার জন্য উভয় পুস্তক হইতে বর্ণনামূলক দুইটি স্থল উদ্ধৃত হইল।

রাজসিংহ

জ্যোৎস্নালোকে, শ্বেত-সৈকত-পুলিন-মধ্য-বাহিনী নীল-সলিলা যমুনার উপকূলে নগরীগণ-প্রধানা মহানগরী দিল্লী প্রদীপ্ত মণিখণ্ডবৎ জ্বলিতেছে—সহস্র সহস্র মর্মরাদি-প্রস্তর-নির্মিত মিনার, গুম্বজ, বুরুজ উর্ধ্বে উত্থিত হইয়া চন্দ্রালোকের রশ্মিরাশি প্রতিফলিত করিতেছে, অতি দূরে কুতবমিনারের বৃহচ্চূড়া ধূমময় উচ্চ স্তম্ভবৎ দেখা যাইতেছিল। নিকটে জুম্মা মসজীদের চারি মিনার নীলাকাশ ভেদ করিয়া চন্দ্রলোকে উঠিয়াছে। রাজপথে রাজপথে পণ্যবীথিকা, বিপণিতে শত শত দীপমালা, পুষ্প-বিক্রেতার পুষ্পরাশির গন্ধ, নাগরিক-জনপরিহিত

পুষ্পরাজির গন্ধ, আতর গোলাপের সুগন্ধ, গৃহে গৃহে সঙ্গীত-ধ্বনি, বহুজাতীয় বাদ্যের নিক্কণ, নাগরীগণের কখন উচ্চ, কখন মধুর হাসি, অলঙ্কার-শিঞ্জিত—এই সমস্ত একত্র হইয়া নরকে নন্দনকাননের ছায়ার ন্যায় অদ্ভুত প্রকার মোহ জন্মাইতেছে। ফুলের ছড়াছড়ি, আতর-গোলাপের ছড়াছড়ি, নর্ত্তকীর নূপুর-নিক্কণ, গায়িকার কণ্ঠে সপ্তসুরের আরোহণ-অবরোহণ, বাদ্যের ঘটা, কমনীয় কামিনী-করতল-কলিত তালেব চট-চটা; মদ্যের প্রবাহ, বিলোল কটাক্ষ-বহ্নি-প্রবাহ; খিচুড়ি-পোলাওয়ের রাশি রাশি; বিকট, কপট, মধুর, চতুর চতুর্বিধ হাসি; পথে পথে অশ্বের পদধ্বনি, দোলার বাহকের বীভৎস ধ্বনি, হস্তীর গলঘণ্টার ধ্বনি, একার ঝন্‌ঝনি—শকটের ঘ্যান্‌ঘ্যানানি।

দেবী চৌধুরাণী

ছাদের উপর গালিচা পাতিয়া সেই বহুরত্নমণ্ডিতা রূপবতী মূর্তিমতী সরস্বতীর ন্যায় বীণাবাদনে নিযুক্তা। চন্দ্রের আলোয় জ্যোৎস্নার মত বর্ণ মিশিয়াছে; তাহার সঙ্গে সেই মৃদুমধুর বীণের ধ্বনিও মিশিতেছে—যেমন জলে জলে চন্দ্রের কিরণ খেলিতেছে, যেমন এ সুন্দরীর অলঙ্কারে চাঁদের আলো খেলিতেছে, এ বন্যকুসুমগন্ধি কৌমুদী-স্নাত বায়ুস্তর-সকলে সেই বীণার শব্দ তেমনি খেলিতে-ছিল। ঝম্‌ঝম ছন্‌ছন ঝনন ঝনন ছনন দম্‌-দম দ্রিম্‌-দ্রিম বলিয়া বীণে কত কি বাজিতেছিল, তাহা আমি বলিতে পারি না। বীণা কখন কাঁদে, কখন রাগিয়া উঠে—কখন নাচে, কখন আদর করে, কখন গর্জ্জিয়া উঠে—বাজিয়ে টিপি টিপি হাসে। ঝিঁঝিট, খাম্বাজ, সিন্ধু—কত

মিঠে রাগিণী বাজিল, কেদার, হাম্বির, বেহাগ—কত গম্ভীর রাগিণী বাজিল, কানাড়া, সাহানা, বাগীশ্বরী—কত জাঁকাল রাগিণী বাজিল। নাদ, কুসুমের মালার মত নদীকল্লোলস্রোতে ভাসিয়া গেল। তারপর দুই একটি পর্‌দা উঠাইয়া নামাইয়া লইয়া, সহসা নূতন উৎসাহে উন্মুখী হইয়া সে বিদ্যাবতী ঝন্‌-ঝন করিয়া বীণের তারে বড় বড় ঘা দিল। কাণের পিপুলপাত দুলিয়া উঠিল, মাথায় সাপের মত চুলের গোছা সব নড়িয়া উঠিল—বীণে নটরাগিণী বাজিতে লাগিল।

* *

লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, রাজসিংহ হইতে উদ্ধৃত অংশে যেমন মাত্র দুই-একটি দেশজ ও বিদেশজ শব্দ ভিন্ন আগাগোড়া খাঁটি সংস্কৃত শব্দের ও সমস্ত পদের ছড়াছড়ি, তেমনি দেবী চৌধুরাণী হইতে উদ্ধৃত

অংশে দুই-একটি খাঁটি সংস্কৃত শব্দ ভিন্ন আগাগোড়া দেশজ ও বিদেশজ বাঙ্গালা শব্দের বাড়াবাড়ি।—দ্বিতীয় অংশ যে গদ্যকাব্য—গদ্যচ্ছন্দে রচিত।

তারপর দেবী চৌধুরাণীর প্রথমেই মা ও মেয়ের সেই অপূর্ব রচনাভঙ্গি-সমন্বিত, অথচ সাবলীল তথা ঝর্‌ঝরে কথোপকথন,—সেই

> 'ও পি—ও পিপি—ও প্রফুল্ল—ও পোড়ারমুখী,'

প্রভৃতি মনে পড়ে; আর সঙ্গে সঙ্গে মানস নয়নে দেখিতে পাই, সেই জ্যোৎস্না-রাত্রিতে বর্ষাকালের জলপ্লাবনে কূলে কূলে পরিপূর্ণা ত্রিস্রোতার তীব্রগতি নদীজলের স্রোতের উপর চন্দ্রের কিরণ—স্রোতে, আবর্তে, কদাচিৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গে জ্বলিতেছে।

> ' কোথাও জল একটু ফুটিয়া উঠিতেছে, —সেখানে একটু চিকিমিকি; কোথাও চরে ঠেকিয়া ক্ষুদ্র বীচি ভগ্ন হইতেছে,—সেখানে একটু ঝিকিমিকি।'

আর সব শেষে গ্রন্থের সেই অমর শেষ কয়েক ছত্র,—সেই

> 'এখন এসো, প্রফুল্ল! একবার লোকালয়ে দাঁড়াও—আমরা তোমায় দেখি। একবার এই সমাজের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বল দেখি, "আমি নূতন নহি, আমি পুরাতন। আমি সেই বাক্যমাত্র। কতবার আসিয়াছি, তোমরা আমায় ভুলিয়া গিয়াছ, তাই আবার আসিলাম"।'

প্রভৃতি উক্তি স্মরণ হইলেই অনায়াসে বুঝিতে পারি যে, দেবী চৌধুরাণীর ভাষা, ভাব, ভঙ্গি সবই অভিনব—দেবী চৌধুরাণী বঙ্কিমচন্দ্রের নূতন স্তরের নবোপন্যাস।

বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনান্ত কাল পর্যন্ত এই তৃতীয় স্তরের ভাষার ক্রমবিকাশ ও অপূর্ব প্রস্ফূরণ স্বতঃই পরিলক্ষিত হয়, আর তাঁহার সম্মোহিনী, সৌন্দর্যময়ী, সুষমাভরা, রসে ভরপূর সুন্দরী আদর্শ ভাষা আনন্দ-সুধাপায়ী পাঠকের মস্তক তাহার অলক্ষিতে ও

অজ্ঞাতসারে সেই রসপরিবেষকের উদ্দেশে প্রণত করিয়া দেয়।

ভাষার এই তৃতীয় স্তরব্যাপী এগারো বৎসরের মধ্যে এই অলিখিতপূর্ব, অনুপম, অভিনব ভাষায় প্রবীণ সাহিত্যসম্রাট্ তাঁহার আজন্ম সাধনার ফল, তাঁহার বহুদর্শী অভিজ্ঞতার পরিণতি, তাঁহার ধ্যান-ও ধারণা লব্ধ জ্ঞান, গবেষণা ও মনীষার সম্যক্ পরিচয় সুসন্ন্যস্তভাবে, সুশৃঙ্খলার -সহিত লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

মনে রাখিতে হইবে, এই শেষ এগারো বৎসরের মধ্যেই তাঁহার 'প্রচাব', কৃষ্ণচরিত্র, ঈশ্বর গুপ্তের কাব্যালোচনা, সীতারাম, বিবিধ প্রবন্ধের অন্তর্গত উৎকৃষ্ট নিবন্ধ-নিচয়, ধর্মতত্ত্ব এবং তাঁহার লুপ্ত-রত্নোদ্ধারের জহুরীপনা লিখিত ও প্রকাশিত হওয়ায় সৎসাহিত্যের প্রচারে সাবা বাঙ্গালায় শিক্ষা, সাধনা ও বসমাধুর্যের প্রবল প্রলয়-প্লাবন উপস্থিত হইয়াছিল।

স্তরবিন্যস্ত এবং প্রথম প্রকাশের কালানুসারে শ্রেণীবদ্ধ লেখমালা

প্রথম স্তর

১। দুর্গেশনন্দিনী

২। কপালকুণ্ডলা

৩। মৃণালিনী

দ্বিতীয় স্তর

বঙ্গদর্শন

৪। বিষবৃক্ষ

৫। কমলাকান্তেব দপ্তর

৬। যুগলাঙ্গুরীয়

৭। ইন্দিরা

লোকরহস্য

বিজ্ঞানরহস্য

৮। চন্দ্রশেখব

৯। রজনী

১০। রাধারাণী

১১। কৃষ্ণকান্তের উইল

বাঙ্গালা ভাষা

১২। মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত
১৩। আনন্দমঠ
১৪। রাজসিংহ

তৃতীয় স্তর

১৫। দেবী চৌধুরাণী
ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনচরিত
ও কবিত্ব
১৬। সীতারাম
প্রচার
'হিন্দুধর্ম ও দেবতত্ত্ব'
কৃষ্ণচরিত
বিবিধ প্রবন্ধ
ধর্মতত্ত্ব
লুপ্তরত্নোদ্ধার
সঞ্জীবনীসুধা

ভাষার প্রথম স্তর

(১৮৬৫—১৮৭২)

নয়

১৮৬৫ সালে দুর্গেশনন্দিনী প্রকাশিত হয় এবং ১৮৮৪ সালে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার শেষ উপন্যাস সীতারাম 'প্রচারে' প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। এই বিশ বৎসরের মধ্যে তিনি যে সকল নারীর রূপবর্ণনা করিয়াছেন, প্রত্যেক গ্রন্থ হইতে রূপচিত্র উন্মোচন-পূর্বক তাঁহার ভাষামাধুর্য প্রদর্শন করাই আমার উদ্দেশ্য। লেখার প্রথম প্রকাশের কালানুসারে চিত্রগুলি পব পর প্রদর্শিত হইলেই, আমার দৃঢ বিশ্বাস, ভাষাব ক্রমবিকাশ স্বতঃই মূর্ত হইয় ়উঠিবে।

১

দুর্গেশনন্দিনী, ১৮৬৫

তিলোত্তমা

তিলোত্তমা সুন্দরী। পাঠক! কখন কিশোর-বয়সে কোন স্থিরা, ধীরা, কোমল-

প্রকৃতি কিশোরীর নবসঞ্চারিত লাবণ্য প্রেমচক্ষুতে দেখিয়াছেন?—একবার মাত্র দেখিয়া, চিরজীবন-মধ্যে যাহার মাধুর্য বিস্মৃত হইতে পারেন নাই? কৈশোরে, যৌবনে, প্রগল্‌ভ-বয়সে, কার্ষে, বিশ্রামে, জাগ্রতে, নিদ্রায়, পুনঃ পুনঃ যে মনোমোহিনী মূর্তি স্মরণ-পথে স্বপ্নবৎ যাতায়াত করে, অথচ তৎসম্বন্ধে কখন চিত্তমালিন্য-জনক লালসা জন্মায় না,—এমন তরুণী দেখিয়াছেন? যদি দেখিয়া থাকেন, তবেই তিলোত্তমার অবয়ব মনোমধ্যে স্বরূপ অনুভব করিতে পারিবেন। যে মূর্তি সৌন্দর্য-প্রভা-প্রাচুর্যে মন প্রদীপ্ত করে, যে মূর্তি লীলালাবণ্যাদির পারিপাট্যে হৃদয়-মধ্যে বিষধর-দন্ত রোপিত করে, এ সে মূর্তি নহে; যে মূর্তি কোমলতা, মাধুর্যাদির গুণে চিত্তের সন্তুষ্টি জন্মায়, এ সেই মূর্তি। যে মূর্তি সন্ধ্যাসমীরণ-

কম্পিতা বসন্তলতার ন্যায় স্মৃতি-মধ্যে দুলিতে থাকে, এ সেই মূর্তি।

তিলোত্তমার বয়স্ ষোড়শ বৎসর, সুতরাং তাঁহার দেহায়তন প্রগল্ভবয়সী রমণীদিগের ন্যায় অদ্যাপি সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় নাই। দেহায়তনে ও মুখাবয়বে কিঞ্চিৎ বালিকাভাব ছিল। সুগঠিত সুগোল ললাট, অপ্রশস্ত নহে, অথচ অতিপ্রশস্তও নহে,—নিশীথ কৌমুদীদীপ্ত নদীর ন্যায় প্রশান্তভাব-প্রকাশক; তৎপার্শ্বে অতিনিবিড়-বর্ণ কুঞ্চিতালক কেশ-সকল ভ্রূযুগে, কপোলে, গণ্ডে, অংসে, উরসে আসিয়া পড়িয়াছে; মস্তকের পশ্চাদ্ভাগে অন্ধকারময় কেশ-রাশি সুবিন্যস্ত মুক্তাহারে গ্রথিত রহিয়াছে; ললাটতলে ভ্রূযুগ সুবঙ্কিম, নিবিড়-বর্ণ, চিত্রকর-লিখিতবৎ হইয়াও কিঞ্চিৎ অধিক সূক্ষ্মাকার, আর এক

সূতা স্থূল হইলে নির্দোষ হইত। পাঠক কি চঞ্চল চক্ষু ভালবাস? তবে তিলোত্তমা তোমার মনোরঞ্জিনী হইতে পারিবেন না। তিলোত্তমার চক্ষু অতি শান্ত; তাহাতে বিদ্যুদ্দামস্ফুরণ-চকিত কটাক্ষ-নিক্ষেপ হইত না, চক্ষু দুইটি অতিপ্রশান্ত. অতিস্নিগ্ধঠাম অতিশান্ত-জ্যোতিঃ। আর চক্ষুর বর্ণ. ঊষাকালে সূর্যোদয়ের কিঞ্চিৎ পূর্বে চন্দ্রাস্তের সময়ে আকাশের যে কোমল নীলবর্ণ প্রকাশ পায়, সেইরূপ; সেই প্রশস্ত পরিষ্কার চক্ষে যখন তিলোত্তমা দৃষ্টি করিতেন, তখন তাহাতে কিছুমাত্র কুটিলতা থাকিত না;—তিলোত্তমা অপাঙ্গে অর্ধদৃষ্টি করিতে জানিতেন না, দৃষ্টিতে কেবল স্পষ্টতা আর সরলতা; দৃষ্টির সরলতাও বটে, মনের সরলতাও বটে; তবে যদি তাঁহার পানে কেহ চাহিয়া দেখিত, তবে

তৎক্ষণাৎ কোমল পল্লব দুইখানি পড়িয়া যাইত; তিলোত্তমা তখন ধরাতল ভিন্ন অন্যত্র দৃষ্টি করিতেন না। ওষ্ঠাধর দুইখানি গোলাবী, রসে টলমল করিত; ছোট ছোট, একটু ঘুরান, একটু ফুলান, একটু হাসি-হাসি; সে ওষ্ঠাধরে যদি একবার হাসি দেখিতে, তবে যোগী হও, মুনি হও, যুবা হও, বৃদ্ধ হও,—আর ভুলিতে পারিতে না। অথচ সে হাসিতে সরলতা ও বালিকাভাব ব্যতীত আর কিছুই ছিল না।

তিলোত্তমার শরীর সুগঠন হইয়াও পূর্ণায়ত ছিল না; বয়সের নবীনতা-প্রযুক্তই হউক, বা শরীরের স্বাভাবিক গঠনের জন্যই হউক, এই সুন্দর দেহে ক্ষীণতা ব্যতীত স্থূলতাগুণ ছিল না। অথচ তন্বীর শরীর-মধ্যে সকল স্থানই সুগোল আর সুললিত। সুগোল

প্রকোষ্ঠে রত্নবলয়, সুগোল বাহুতে হীরকমণ্ডিত তাড়, সুগোল অঙ্গুলিতে অঙ্গুরীয়, সুগোল উরুতে মেখলা, সুগঠন অংসোপরে স্বর্ণহার, সুগঠন কণ্ঠে রত্নকণ্ঠী, সর্বত্রের গঠন সুন্দর!

২

কপালকুণ্ডলা, ১৮৬৬

মতিবিবি

যদি এই রমণী নির্দোষ-সৌন্দর্য-বিশিষ্টা হইতেন, তবে বলিতাম, পুরুষ পাঠক! ইনি আপনার গৃহিণীর ন্যায় সুন্দরী। আর সুন্দরী পাঠকারিণি! ইনি আপনার দর্পণস্থ ছায়ার ন্যায় রূপবতী। তাহা হইলে রূপবর্ণনার একশেষ হইত। দুর্ভাগ্যবশতঃ ইনি সর্বাঙ্গসুন্দরী নহেন; সুতরাং নিরস্ত হইতে হইল।

ইনি যে নির্দোষসুন্দরী নহেন তাহা বলিবার কারণ এই যে, প্রথমতঃ ইঁহার শরীর মধ্যমাকৃতি অপেক্ষা কিঞ্চিৎ দীর্ঘ; দ্বিতীয়তঃ অধরৌষ্ঠ কিছু চাপা; তৃতীয়তঃ প্রকৃতপক্ষে ইনি গৌরাঙ্গী নহেন।

শরীর ঈষদ্দীর্ঘ বটে, কিন্তু হস্তপদ-হৃদয়াদি সর্বাঙ্গ সুগোল, সম্পূর্ণীভূত। বর্ষাকালে বিটপিলতা যেমন আপন পত্র-রাশির বাহুল্যে দলমল করে, ইঁহার শরীর তেমনই আপন পূর্ণতায় দলমল করিতে-ছিল; সুতরাং ঈষদ্দীর্ঘ দেহও পূর্ণতাহেতু অধিকতর শোভার কারণ হইয়াছিল। যাঁহাদিগকে প্রকৃতপক্ষে গৌরাঙ্গী বলি, তাঁহাদিগের মধ্যে কাহারও বর্ণ পূর্ণচন্দ্র-কৌমুদীর ন্যায়, কাহারও কাহারও ঈষদা-রক্তবদনা ঊষার ন্যায়। ইঁহার বর্ণ এতদুভয়বর্জিত; সুতরাং ইঁহাকে প্রকৃত গৌরাঙ্গী বলিলাম না বটে, কিন্তু মুগ্ধকরী

শক্তিতে ইঁহার বর্ণও ন্যূন নহে। ইনি শ্যামবর্ণা। "শ্যামা মা" বা "শ্যামসুন্দর" যে শ্যামবর্ণের উদাহরণ, এ সে শ্যামবর্ণ নহে,—তপ্তকাঞ্চনের যে শ্যামবর্ণ, এ সেই শ্যাম। পূর্ণচন্দ্রকরলেখা, অথবা হেমাম্বুদ-কিরীটিনী ঊষা যদি গৌরাঙ্গীদিগের বর্ণ-প্রতিমা হয়, তবে বসন্ত-প্রসূত নবচূতদল-রাজির শোভা এই শ্যামার বর্ণের অনুরূপ বলা যাইতে পারে। পাঠক মহাশয়-দিগের মধ্যে অনেকে গৌরাঙ্গীর বর্ণের প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন, কিন্তু যদি কেহ এরূপ শ্যামার মন্ত্রে মুগ্ধ হয়েন, তবে তাঁহাকে বর্ণজ্ঞানশূন্য বলিতে পারিব না। এ কথায় যাঁহার বিরক্তি জন্মে, তিনি একবার নবচূতপল্লববিরাজী ভ্রমরশ্রেণীর ন্যায় সেই উজ্জ্বলশ্যাম ললাটবিলম্বী অলকাবলী মনে করুন; সেই সপ্তমী-চন্দ্রাকৃত ললাট-তলস্থ অলকস্পর্শী ভ্রূযুগ

মনে করুন ; সেই পক্কচূতোজ্জ্বল কপোল-দেশ মনে করুন ; তন্মধ্যবর্তী ঘোরারক্ত ক্ষুদ্র ওষ্ঠাধর মনে করুন ; তাহা হইলে এই অপরিচিতা রমণীকে সুন্দরীপ্রধানা বলিয়া অনুভূত হইবে। চক্ষু দুইটি অতি বিশাল নহে, কিন্তু সুবঙ্কিম পল্লবরেখা-বিশিষ্ট—আর অতিশয় উজ্জ্বল ; তাহার কটাক্ষ স্থির, অথচ মর্ম্মভেদী। তোমার উপর দৃষ্টি পড়িলে তুমি তৎক্ষণাৎ অনুভব কর যে, এ স্ত্রীলোক তোমার মন পর্য্যন্ত দেখিতেছে। দেখিতে দেখিতে সে মর্ম্ম-ভেদী দৃষ্টির ভাবান্তর হয় ; চক্ষু সুকোমল স্নেহময় রসে গলিয়া যায়। আবার কখন-বা তাহাতে কেবল সুখাবেশজনিত ক্লান্তি-প্রকাশ মাত্র, যেন সে নয়ন মন্মথের স্বপ্নশয্যা,—কখন-বা লালসাবিস্ফারিত মদনরসে টলমলায়মান। আবার কখন লোলাপাঙ্গে ক্রূর কটাক্ষ—যেন মেঘমধ্যে

বিদ্যুদ্দাম। মুখকান্তি-মধ্যে দুইটি অনির্বচনীয় শোভা। প্রথম সর্বত্রগামিনী বুদ্ধির প্রভাব, দ্বিতীয় মহান্ আত্মগরিমা। তৎকারণে যখন তিনি মরালগ্রীবা বঙ্কিম করিয়া দাঁড়াইতেন, তখন সহজেই বোধ হইত, ইনি রমণীকুলরাজ্ঞী।

সুন্দরীর বয়ঃক্রম সপ্তবিংশতি বৎসর—ভাদ্রমাসের ভরা নদী। ভাদ্রমাসের নদীজলের ন্যায় ইঁহার রূপরাশি টলটল করিতেছিল—উছলিয়া পড়িতেছিল। বর্ণাপেক্ষা, নয়নাপেক্ষা, সর্বাপেক্ষা সেই সৌন্দর্যের পরিপ্লব মুগ্ধকর। পূর্ণ যৌবন-ভরে সর্বশরীর সতত ঈষচ্চঞ্চল,—বিনা বায়ুতে শরতের নদী যেমন ঈষচ্চঞ্চল, তেমনি চঞ্চল; সে চাঞ্চল্য মুহুর্মুহুঃ নূতন নূতন শোভাবিকাশের কারণ।

৩

মৃণালিনী, ১৮৬৯

মনোরমা

সেই রত্নপ্রদীপদীপ্ত দেবমন্দিরে, চন্দ্রালোক-বিভাসিত দ্বারদেশে, মনোরমাকে দেখিয়া পশুপতির হৃদয় উচ্ছ্বাসোম্মুখ সমুদ্রের ন্যায় স্ফীত হইয়া উঠিল। মনোরমা নিতান্ত খর্বাকৃতি নহেন, তবে যে তাঁহাকে বালিকা বলিয়া বোধ হইত, তাহার হেতু এই যে, মুখকান্তি অনির্বচনীয় কোমল, অনির্বচনীয় মধুর, নিতান্ত বালিকা-বয়সের ঔদার্যবিশিষ্ট; সুতরাং হেমচন্দ্র যে তাঁহার পঞ্চদশ বৎসর বয়ঃক্রম অনুভব করিয়াছিলেন, তাহা অন্যায় হয় নাই। মনোরমার বয়ঃক্রম যথার্থ পঞ্চদশ, কি ষোড়শ, কি তদধিক,

কি তন্ন্যন, তাহা ইতিহাস লেখে না। পাঠক মহাশয় স্বয়ং সিদ্ধান্ত করিবেন।

মনোরমার বয়স্ যতই হউক না কেন, তাঁহার রূপরাশি অতুল—চক্ষুতে ধরে না। বাল্যে, কৈশোরে, যৌবনে, সর্বকালে সে রূপরাশি দুর্লভ। একে বর্ণ সোণার চাঁপা, তাহাতে ভুজঙ্গশিশুশ্রেণীর ন্যায় কুঞ্চিত অলকশ্রেণী মুখখানি বেড়িয়া থাকে; এক্ষণে বাপীজলসিঞ্চনে সে কেশ ঋজু হইয়াছে। অর্ধচন্দ্রাকৃত নির্মল ললাট, ভ্রমরভর-স্পন্দিত নীলপুষ্পতুল্য কৃষ্ণতার চঞ্চল লোচনযুগল; মুহুর্মুহুঃ আকুঞ্চন-বিস্ফারণ-প্রবৃত্ত রন্ধ্রযুক্ত স্থগঠন নাসা; অধরৌষ্ঠ যেন প্রাতঃশিশিরে সিক্ত, প্রাতঃ-সূর্যের কিরণে প্রোদ্ভিন্ন রক্তকুসুমাবলীর স্তরযুগল-তুল্য; কপোল যেন চন্দ্র-করোজ্জ্বল, নিতান্ত স্থির, গঙ্গাম্বুবিস্তারবৎ প্রসন্ন; শাবকহিংসাশঙ্কায় উত্তেজিতা

হংসীর ন্যায় গ্রীবা,—বেণী বাঁধিলেও সে গ্রীবার উপরে আবদ্ধ ক্ষুদ্র কুঞ্চিত কেশ-সকল আসিয়া কেলি করে। দ্বিরদরদ যদি কুসুমকোমল হইত, কিংবা চম্পক যদি গঠনোপযোগী কাঠিন্য পাইত, কিংবা চন্দ্রকিরণ যদি শরীরবিশিষ্ট হইত, তবে তাহাতে সে বাহুযুগল গড়িতে পারা যাইত,—সে হৃদয় কেবল সেই হৃদয়েই গড়া যাইতে পারিত। এ সকলই অন্য সুন্দরীর আছে। মনোরমার রূপরাশি অতুল—কেবল তাঁহার সর্বাঙ্গীণ সৌকুমার্যের জন্য। তাঁহার বদন সুকুমার; অধর, ভ্রূযুগল, ললাট সুকুমার, সুকুমার কপোল; সুকুমার কেশ; অলকাবলী যে ভুজঙ্গশিশুরূপী, সেও সুকুমার ভুজঙ্গশিশু। গ্রীবায়, গ্রীবাভঙ্গীতে সৌকুমার্য; বাহুতে, বাহুর প্রক্ষেপে সৌকুমার্য; হৃদয়ের উচ্ছ্বাসে সেই

সৌকুমার্য ; সুকুমার চরণ, চরণবিন্যাস সুকুমার। গমন সুকুমার, বসন্তবায়ু-সঞ্চালিত কুসুমিত লতার মন্দান্দোলন-তুল্য ; বচন সুকুমার, —নিশীথ-সময়ে জলরাশি-পার হইতে সমাগত বিরহ-সঙ্গীত-তুল্য ; কটাক্ষ সুকুমার, ক্ষণমাত্র-জন্য মেঘমালা-মুক্ত সুধাংশুর কিরণ-সম্পাত-তুল্য। আর ঐ যে মনোরমা দেবীগৃহদ্বারদেশে দাঁড়াইয়া আছেন,—পশুপতির মুখাবলোকন-জন্য উন্নতমুখী,—নয়নতারা ঊর্ধ্বস্থাপনস্পন্দিত, আর বাপী-জলার্দ্র অবদ্ধ কেশ-রাশির কিয়দংশ একহস্তে ধরিয়া, একচরণ ঈষন্মাত্র অগ্রবর্ত্তী করিয়া, যে ভঙ্গীতে মনোরমা দাঁড়াইয়া আছেন, ও ভঙ্গীও সুকুমার,—নবীন সূর্য্যোদয়ে সদ্যঃ-প্রফুল্লদলমালাময়ী নলিনীর প্রসন্ন ব্রীড়াতুল্য সুকুমার।

ভাষার দ্বিতীয় স্তর

(১৮৭২—১৮৮২)

দশ

৪

বিষবৃক্ষ, ১৮৭২

কুন্দনন্দিনী

(নগেন্দ্রনাথ হরদেব ঘোষালকে পত্রে লিখিতেছেন)—তাহার বয়স্ তের বৎসব, তাহাকে দেখিয়া বোধ হয় যে, এই সৌন্দর্যের সময়। প্রথম যৌবন-সঞ্চারের অব্যবহিত পূর্বেই যেরূপ মাধুর্য এবং সরলতা থাকে, পরে তত থাকে না। এই কুন্দের সবলতা চমৎকাব ; সে কিছুই বুঝে না। আজিও রাস্তাব বালকদিগেব সহিত খেলা করিতে ছুটে ; আবার বাবণ

করিলেই প্রতিনিবৃত্তা হয়। কমল তাহাকে লেখাপড়া শিখাইতেছে। কমল বলে, লেখাপড়ায় তাহার দিব্য বুদ্ধি। কিন্তু অন্য কোন কথাই বুঝে না। বলিলে বৃহৎ নীল দুইটি চক্ষু—চক্ষু দুইটি শরতের মত সর্বদাই স্বচ্ছ জলে ভাসিতেছে—সেই দুইটি চক্ষু আমার মুখের উপর স্থাপিত করিয়া চাহিয়া থাকে, কিছু বলে না—আমি সে চক্ষু দেখিতে দেখিতে অন্যমনস্ক হই, আর বুঝাইতে পারি না। ……চক্ষু দুইটি যে কিরূপ, তাহা আমি এ পর্যন্ত স্থির করিতে পারিলাম না। তাহা দুই বার এক রকম দেখিলাম না। আমার বোধ হয় যেন, এ পৃথিবীর সে চোখ নয়; এ পৃথিবীর সামগ্রী যেন ভাল করিয়া দেখে না, অন্তরীক্ষে যেন কি দেখিয়া তাহাতে নিযুক্ত আছে। কুন্দ যে নির্দোষ সুন্দরী, তাহা নহে।

অনেকের সঙ্গে তুলনায় তাহার মুখাবয়ব অপেক্ষাকৃত অপ্রশংসনীয় বোধ হয়; অথচ আমার বোধ হয়, এমন সুন্দরী কখনও দেখি নাই। বোধ হয় যেন, কুন্দনন্দিনীতে পৃথিবী ছাড়া কিছু আছে। রক্তমাংসের যেন গঠন নয়; যেন চন্দ্রকর কি পুষ্প-সৌরভকে শরীরী করিয়া তাহাকে গড়িয়াছে। তাহার সঙ্গে তুলনা করিবার সামগ্রী হঠাৎ মনে হয় না। অতুল্য পদার্থটি তাহার সর্বাঙ্গীণ শান্ত-ভাব-ব্যক্তি—যদি শরচ্চন্দ্রের কিরণ-সম্পাতে যে স্বচ্ছ সরোবরের ভাব-ব্যক্তি তাহা বিশেষ করিয়া দেখ, তবে ইহার সাদৃশ্য কতক অনুভূত করিতে পারিবে। তুলনার অন্য সামগ্রী পাইলাম না।

৩

কমলাকান্তের দপ্তর, ১৮৭৩

প্রসন্ন

প্রসন্ন দেখিতে শুনিতে মোটাসোটা, গোলগাল, বয়সে চল্লিশের নীচে, দাঁতে মিসি, হাসিভরা মুখ, কপালের একটি ছোট উল্‌কী টিপের মত দেখাইত; সে রসের হাসি পথে ছড়াইতে ছড়াইতে যাইত।······প্রসন্ন এবং তাহার গাই, উভয়েই সুন্দরী; উভয়েই স্থূলাঙ্গী, লাবণ্যময়ী এবং ঘটোঘ্নী।

একটি যুবতী

এক যুবতী জলের কলসী কক্ষে লইয়া যাইতেছে। তাহার মুখের উপর গভীরকৃষ্ণ দোদুল্যমান কুঞ্চিতালকরাজি, গভীরকৃষ্ণ ভ্রূযুগল এবং গভীরকৃষ্ণ চঞ্চল

নয়নতারা দেখিয়া বোধ হইল, যেন পদ্মবনে কতকগুলা ভ্রমর ঘুরিয়া বেড়াইতেছে—বসিতেছে না, উড়িয়া বেড়াইতেছে। তাহার গমনে যেরূপ অঙ্গ দুলিতেছিল, বোধ হইল, যেন লাবণ্যের নদীতে ছোট ছোট ঢেউ উঠিতেছে ; তাহার প্রতি পদক্ষেপে বোধ হইল, যেন পাঁজরের হাড় ভাঙ্গিয়া দিয়া চলিয়া যাইতেছে।

৬

যুগলাঙ্গুরীয়, ১৮৭৩

হিরণ্ময়ী

হিরণ অষ্টাদশ বৎসরের হইয়া উদ্যান-মধ্যস্থ নবপল্লবিত চূতবৃক্ষের ন্যায় ধনদাসের গৃহ শোভা করিতে লাগিলেন।

৭

ইন্দিরা, ১৮৭৩

সুভাষিণী

এমন মুখ দেখি নাই। যেন পদ্মটি ফুটিয়া আছে—চারিদিক্ হইতে সাপের মত কোঁকড়া চুলগুলা ফণা তুলিয়া পদ্মটা ঘেরিয়াছে। খুব বড় বড় চোখ—কখন স্থির, কখন হাসিতেছে। ঠোঁট দুখানি পাতলা, রাঙ্গা, টক্‌টকে, ফুলের পাপ্‌ড়ীর মত উল্‌টান; মুখখানি ছোট,—সর্বশুদ্ধ যেন একটি ফুটন্ত ফুল। গড়ন-পিটন কি রকম, তাহা ধরিতে পারিলাম না। আমগাছের যে ডাল কচিয়া যায়, সে ডাল যেমন বাতাসে খেলে, সেই রকম তাহার সর্বাঙ্গ খেলিতে লাগিল—যেমন নদীতে ঢেউ খেলে, তাহার শরীরে তেমনই কি একটা খেলিতে লাগিল—আমি কিছু

ধরিতে পারিলাম না, তার মুখে কি একটা যেন মাখান ছিল, তাহাতে আমাকে যাদু করিয়া ফেলিল। পাঠককে স্মরণ করিয়া দিতে হইবে না যে, আমি পুরুষমানুষ নহি—মেয়েমানুষ—নিজেও একদিন একটি সৌন্দর্যগর্বিত ছিলাম।

৮

চন্দ্রশেখর, ১৮৭৩

শৈবলিনী

বাতায়নপথে সমাগত চন্দ্রকিরণ সুপ্তা সুন্দরী শৈবলিনীর মুখে নিপতিত হইয়াছে। চন্দ্রশেখর প্রফুল্লচিত্তে দেখিলেন, তাঁহার গৃহসরোবরে চন্দ্রের আলোতে পদ্ম ফুটিয়াছে। তিনি দাঁড়াইয়া, দাঁড়াইয়া, দাঁড়াইয়া, বহুক্ষণ ধরিয়া প্রীতি-বিস্ফারিত নেত্রে শৈবলিনীর

অনিন্দ্যসুন্দর মুখমণ্ডল নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, চিত্রিত ধনুঃ-খণ্ডবৎ নিবিড়কৃষ্ণ ভ্রূযুগলতলে মুদ্রিত পদ্মকোরক-সদৃশ লোচন-পদ্ম দুটি মুদিয়া রহিয়াছে ;—সেই প্রশস্ত নয়নপল্লবে সুকোমলা সমগামিনী রেখা দেখিলেন। দেখিলেন, ক্ষুদ্র কোমল করপল্লব নিদ্রাবেশে কপোলে ন্যস্ত হইয়াছে—যেন কুসুমবাশির উপরে কে কুসুমরাশি ঢালিয়া রাখিয়াছে। মুখমণ্ডলে কর-সংস্থাপনের কারণে সুকুমার রসপূর্ণ-তাম্বূল-রাগরক্ত ওষ্ঠাধর ঈষদ্ভিন্ন করিয়া, মুক্তাসদৃশ দন্তশ্রেণী কিঞ্চিন্মাত্র দেখা দিতেছে। একবার যেন, কি সুখ-স্বপ্ন দেখিয়া সুপ্তা শৈবলিনী ঈষৎ হাসিল—যেন একবার জ্যোৎস্নার উপর বিদ্যুৎ হইল! আবার সেই মুখমণ্ডল পূর্ববৎ সুষুপ্তি-সুস্থির হইল। সেই বিলাস-

চাঞ্চল্য-শূন্য সুষুপ্তি-সুস্থির বিংশতিবর্ষীয়া যুবতীর প্রফুল্ল মুখমণ্ডল দেখিয়া চন্দ্রশেখরের চক্ষে অশ্রু বহিল।

৯

রজনী, ১৮৭৪

লবঙ্গলতা

তখন লবঙ্গের বিবাহের বয়ঃক্রম উত্তীর্ণ হইয়াছিল— লবঙ্গ-কলিকা ফোট-ফোট হইয়াছিল। চক্ষের চাহনী চঞ্চল অথচ ভীত হইয়া আসিয়াছিল—উচ্চহাস্য মৃদু এবং ব্রীড়াযুক্ত হইয়া উঠিয়াছিল—দ্রুত-গতি মন্থর হইয়া আসিতেছিল। আমি মনে করিতাম, এমন সৌন্দর্য কখন দেখি নাই—এ সৌন্দর্য যুবতীর অদৃষ্টে কখন ঘটে না! বস্তুতঃ অতীতশৈশব অথচ অপ্রাপ্তযৌবনার সৌন্দর্য এবং অস্ফুটবাক্

শিশুর সৌন্দর্য—ইহাই মনোহর,—যৌবনের সৌন্দর্য তাদৃশ নহে। যৌবনে বসন-ভূষণের ঘটা, হাসি-চাহনীর ঘটা;—বেণীর দোলনি, বাহুর বলনি, গ্রীবার হেলনি, কথার ছলনি,—যুবতীর রূপের বিকাশ এক প্রকার দোকানদারি। আর আমরা যে চক্ষে সে সৌন্দর্য দেখি, তাহাও বিকৃত। যে সৌন্দর্যের উপভোগে ইন্দ্রিয়ের সহিত সম্বন্ধযুক্ত চিত্তভাবের সংস্পর্শ মাত্র নাই, সেই সৌন্দর্যই সৌন্দর্য।

১০

রাধারাণী, ১৮৭৫

রাধারাণী

রাধারাণী পরমসুন্দর ষোড়শবর্ষীয় কুমারী। কিন্তু সে অন্তঃপুরমধ্যে বাস

করে—তাহার সে রূপরাশি কেহ দেখিতে পায় না। .. ..

রাধারাণী আসিবামাত্র দর্শকের (রুক্মিণীকুমারের) বোধ হইল যে, সেই কক্ষমধ্যে এক অভিনব সূর্যোদয় হইল—রূপের আলোকে তাঁহার মস্তকের কেশ পর্যন্ত যেন প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল।

১১

কৃষ্ণকান্তের উইল, ১৮৭৬

রোহিণী

রোহিণী একা জল আনিতে যায়—দল বাঁধিয়া যত হাল্‌কা মেয়ের সঙ্গে হাল্‌কা হাসি হাসিতে হাসিতে, হাল্‌কা কলসীতে হাল্‌কা জল আনিতে যাওয়া রোহিণীর অভ্যাস নহে। রোহিণীর কলসী ভারী, চালচলনও ভারী। তবে রোহিণী বিধবা।

কিন্তু বিধবার মত কিছু রকম নাই। অধরে পানের রাগ, হাতে বালা, ফিতে-পেড়ে-ধুতিপরা, আর কাঁধের উপর চারু-বিনির্মিতা, কালভুজঙ্গিনীতুল্যা, কুণ্ডলী-কৃতা, লোলায়মানা, মনোমোহিনী কবরী। পিতলের কলসী কক্ষে ; চলনের দোলনে ধীরে ধীরে সে কলসী নাচিতেছে—যেমন তরঙ্গে তরঙ্গে হংসী নাচে, সেইরূপ ধীরে ধীরে গা দোলাইয়া কলসী নাচিতেছে। চরণ দুইখানি আস্তে আস্তে বৃক্ষচ্যুত পুষ্পের মত মৃদু মৃদু মাটিতে পড়িতেছিল—অমনি সে রসের কলসী তালে তালে নাচিতেছিল। হেলিয়া দুলিয়া, পালভরা জাহাজের মত ঠমকে ঠমকে, চমকে চমকে রোহিণীসুন্দরী সরোবর-পথ আলো করিয়া জল লইতে আসিতেছিল।

এইখানে দ্বিতীয় স্তরের চিত্রপ্রদর্শন স্থগিত রাখা হইল।

এগারো

এইবার প্রথম ও দ্বিতীয় স্তরের চিত্রগুলি লইয়া একটু আলোচনা করিব—তথাকথিত সমালোচনা নয়,—ভাষার মাধুর্য বুঝিবার জন্য প্রচেষ্টা মাত্র।

প্রথম স্তরের রূপালেখ্যগুলির বৈশিষ্ট্য—সেগুলি আয়তনে সুদীর্ঘ, সংস্কৃতবহুল শব্দ-সম্পদে ভারাক্রান্ত; উহাদের মধ্যে অলঙ্কারের—প্রধানতঃ রূপক ও উপমার—আতিশয্য; প্রাকৃত তথা বাঙ্গালা শব্দ ও পদের অত্যন্তাভাব,—এক কথায় সংস্কৃত কবিগণের অনুসরণে চিত্রিত,—প্রতি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা।

তিলোত্তমার ললাট, কেশ, ভ্রূ, চক্ষু, দৃষ্টি, ওষ্ঠাধর, হাসি, বয়স্, শরীরের গঠন ও দেহের বিভিন্ন অংশে শোভিত ভূষণের ব্যাখ্যা আছে।

মতিবিবির হাসিটি কেমন, আর তাহার গায়ের কোথায় কি কি অলঙ্কার ছিল, তাহা জানিতে পারা যায় না বটে, কিন্তু বাকি সকল বিষয় তিলোত্তমার সঙ্গে নিখুঁতভাবে তুলনা করা যায়। অধিকন্তু মতিবিবির গায়ের রং-সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা জন্মে এবং

তাহার গ্রীবাভঙ্গি চোখের সামনে ফুটিয়া উঠে। মতিবিবির বর্ণ-বর্ণন-প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র রমণীর দৈহিক বিভিন্ন বর্ণের যে অপূর্ব বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা বঙ্গসাহিত্যে অনুপম।

তারপর মনোরমার রূপচিত্রে চিত্রকর আরও দুই-একটি নূতন বিষয়ে তূলিকাপাত করিয়াছেন, যেমন তাহার নয়ন-তারকা, নাসা, বাহু ও হৃদয় এবং সমগ্র দেহের সৌকুমার্য। তাহার নাকি সবই সুকুমার—তাহার বদন সুকুমার, অধর সুকুমার, ললাট সুকুমার,……এমন কি চরণ, গমন ও বচন পর্যন্ত সুকুমার। আর পশুপতির মুখখানি দেখিবার উদ্দেশ্যে ঐ যে মনোরমা উপর দিকে চাহিয়া আছে,—তাহার ডান হাতে ভিজাচুলের গোছা আর বাঁ পা একটুখানি আগাইয়া দেওয়া—এই যে দাঁড়াইবার ভঙ্গি—এ ভঙ্গিমাও সুকুমার—কিসের মত সুকুমার,—না, অরুণোদয়ে সদ্যঃপ্রস্ফুটিত নলিনীর প্রসন্ন ব্রীড়ার ন্যায় সুকুমার। দণ্ডায়মানা মনোরমার ফটো উঠিয়াছে চমৎকার, কিন্তু তবু বলিতে হইতেছে—উপমা তেমন জমে নাই। না জমিবার কথা, কেন-না এই প্রথম স্তরে বঙ্কিমচন্দ্র সংস্কৃত সমস্ত

পদের ও সংস্কৃত উপমার ঝোঁক এড়াইতে পারেন নাই—মোহ কাটাইয়া উঠিতে সমর্থ হন নাই।

মনোরমার এই মনোমুগ্ধকর বর্ণন পাঠ করিলেই কিন্তু চিরমধুর মধুরাষ্টকের

> অধরং মধুরং বদনং মধুরং নয়নং মধুরং
> হসিতং মধুরম্।
> হৃদয়ং মধুরং গমনং মধুরং মথুরাধিপতে-
> রখিলং মধুরম্॥

প্রভৃতি শ্লোক মনে পড়িয়া যায়।

এই মোহিনী মনোরমার চিত্র অঙ্কিত করিতে গিয়া বঙ্কিমচন্দ্রকে 'মৃণালিনী'তে একটি গোটা পরিচ্ছেদ লিখিতে হইয়াছিল। তাই সেই মাধুর্যময় দেহের উপর দেবীপার্শ্বস্থিত রত্নদীপের আলোক যেমন পতিত হইল, পশুপতি অতৃপ্তনয়নে দেখিতে লাগিলেন।

মোট কথা প্রথম স্তরের রূপবর্ণনা আয়তনে সুদীর্ঘ এবং সংস্কৃতানুগ হইলেও পদলালিত্যে ও বর্ণননৈপুণ্যে টলটল করিতেছে। কিন্তু ভাষার সম্মোহিনী শক্তিতে আর প্রতি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের

পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনাতিশয্যে সমগ্র তথা সর্বাঙ্গীণ রূপ-সুষমা হৃদয়ে ধারণ করা কঠিন হইয়া দাঁড়ায়—একটিকে খেয়ালে রাখিতে গিয়া তৎক্ষণাৎ অন্যটির খেই হারাইয়া ফেলিতে হয়।

তিল তিল সৌন্দর্য চুনিয়া চুনিয়া শিল্পী যে সব তিলোত্তমা গঠন করিয়াছেন, সেই অপূর্ব শিল্প-চাতুর্যের গঠন-নৈপুণ্যে যদি দর্শকের দৃষ্টি তথা চিত্ত কোন অঙ্গবিশেষের সৌন্দর্যে মোহিত হইয়া আর পাঁচটি অঙ্গের প্রতি দৃষ্টিপাত অথবা মনঃসংযোগ করিতে অসমর্থ হয়, তাহা হইলে এই সব তিলোত্তমা-গঠনে শিল্পীর খুঁত ধরা পড়ে না কি? এই সম্বন্ধে আর বেশি কিছু বলা বাহুল্য মনে করি।

বারো

প্রথম স্তরের চিত্রাঙ্কন-মধ্যে যেগুলিকে খুঁত বা ত্রুটি বলিয়া উল্লেখ করিলাম দ্বিতীয় স্তরে সেগুলির একান্ত অসদ্ভাব।

প্রথম ও দ্বিতীয় স্তরের ভাষার আলোচনা করিতে গিয়া সর্বাগ্রে বলিব যে,—কপালকুণ্ডলায় ভাদ্র মাসের ভরা নদীর জলের ন্যায় রমণীর রূপরাশি

মাত্র একটি বার 'টলটল' করিয়াছিল—'উছলিয়া' পড়িয়াছিল, কিন্তু বিষবৃক্ষে বঙ্কিমচন্দ্র 'গোরু ঠেঙ্গাইলেন'; কমলাকান্তে 'পাঁজরের হাড় ভাঙ্গিয়া দিয়া' 'রসের হাসি পথে ছড়াইতে ছড়াইতে' চলিলেন। ইন্দিরায় 'আমগাছের ডাল কচিয়া গেল'; চন্দ্রশেখরে সুষুপ্তি-সুস্থিরা শৈবলিনীর ঈষৎ হাসিতে 'জ্যোৎস্নার উপর বিদ্যুৎ হইল'; রজনীতে 'লবঙ্গ-কলিকা ফোট ফোট হইল'; আর কৃষ্ণকান্তের উইলে রোহিণীর 'রসের কলসী তালে তালে নাচিতে লাগিল'।

দ্বিতীয় স্তরে শুধু ভাষার মাধুর্যই অধিকতর পরিস্ফুট নহে,—লেখকের লেখনী-পরিচালনায় সংযমও অসাধারণ, অথচ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রেখাপাতে চিত্রগুলির শোভা ও সৌন্দর্য আরও বেশি করিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে।

কুন্দনন্দিনীর সেই 'বৃহৎ নীল চক্ষু দুইটির' কথা মনে পড়াতেই—এই এক শুধু চোখের বর্ণনার মধ্য দিয়াই কুন্দের সবকিছু আমাদের কাছে ধরা পড়িয়া গিয়াছে। তাহার গায়ের রং কেমন, তাহা আমরা জানি না—জানিবার স্পৃহা বা আকাঙ্ক্ষাও আমাদের

নাই, কেন-না, আমরা যে তাহার ভিতরকার সবটুকুই খুঁটাইয়া জানিতে পারিয়াছি। তুলনার অন্য সামগ্রী না পাইয়া চিত্রকর 'শরচ্চন্দ্রের কিরণ-সম্পাতে স্বচ্ছ সরোবরের ভাবব্যক্তির সহিত' তাহার সর্বাবয়বের শান্ত, স্নিগ্ধ ভাবটির তুলনা করিয়া, তুলির শেষ টান টানিয়া চিত্রখানিকে 'ফিনিস্' করিয়াছেন। ওস্তাদের ওস্তাদি সুরু হইয়াছে!

দুই-তিনটি ছত্রে প্রসন্ন গোয়ালিনীর যে ছবি আঁকা হইয়াছে, তাহা দেখিয়া প্রতিবেশিনী দুই-একজন বর্ষীয়সী রসবতী গয়লাবৌকে আমার ন্যায় প্রবীণদের আপনা হইতে মনে পড়িয়া যায়। সেই ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে পিতলের ছোট কলসী কক্ষে লইয়া, মকরমুখো অনন্তের নিগড়ে নিটোল বাহুদ্বয়ের ঝরা রূপ বাঁধিয়া ফেলিয়া, পথের দুই পার্শ্বে 'রসের হাসি ছড়াইতে ছড়াইতে' মন্থর মরাল-গমনে যাইতে আমরা পাড়ার দুই-একটি গয়লাবৌকে প্রত্যহ দেখিতাম। আর সেই ঘটোধ্রীদ্বয়ের উপর—সেই

'একজন গব্যরস সৃজন করেন, আর একজন হাস্যরস সৃজন করেন'—

উভয়েরই উপর কোনরূপ টীকাটিপ্পনী আমার পক্ষে, এ বয়সে সম্পূর্ণ অসম্ভব !

সুভাষিণীর 'মুখে কি একটা যেন মাখানো ছিল, তাহাতে লেখিকাকে যাদু করিয়া ফেলিল।' এমনতর কি মাঝে মাঝে আমাদের অনেককেই করে না ? করে। পুরুষ আমরা, আমাদের অনেককেই যে ঐ কি-একটা-মাখানো মুখ যাদু করিয়া ফেলে—ইহা ত স্বাভাবিক। কিন্তু সুভাষিণীর মুখখানি, একদিন 'যে সৌন্দর্য-গর্বিতা ছিল সেই ইন্দিরাকেও যাদু করিয়া ফেলিল'—এই-টুকুই বৈশিষ্ট্য। এইখানেই অতিপ্রচ্ছন্নভাবে, শুধু ইঙ্গিতে আর ইসারায় কৃতী শিল্পীর গুণগরিমা ফুটিয়া উঠিয়াছে।

'বাধারাণীর রূপের আলোকে রুক্মিণীকুমারের মস্তকেব কেশ পর্যন্ত প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল।'—অতি স্বল্প কথায়, স্বচ্ছ সবল ভাষায়, সাধারণ উপমাব সহায়তায এই সব রূপের 'সংক্ষিপ্ত চিত্রের' অথবা snapshot বা miniature-এর জোড়া মেলা ভার।

তেরো

তারপর সুষুপ্তি সুস্থিরা সুন্দরী শৈবলিনীর ছবি আর বিধবা রোহিণী ঠাকুরাণীর লিপ্‌স্টিকের বদলে অধরে পানের রাগ, হাতে বালা, ফিতেপেড়ে ধুতি-পরা, কাঁধের উপর চারুবিনির্মিতা কালভূজঙ্গিনী-তুল্যা কুণ্ডলীকৃতা লোলায়মানা মনোমোহিনী কবরী, পিতলের ভারী-কলসী-কক্ষে, হেলিয়া-দুলিয়া পালভরা জাহাজের মত, ঠমকে ঠমকে, চমকে চমকে সরোবর-পথ আলো করিয়া জল আনিতে যাওয়া—এই দুইটি অনিন্দ্য, অতুল্য, অপূর্ব বর্ণন-চাতুর্যের তুলনা আর কোথাও আছে নাকি ?

স্থান-কাল-পাত্র-পাত্রী-ভেদে, পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনের পার্থক্য-হেতু এবং পটভূমির বিভিন্নতার জন্য উভয় বর্ণনার ভাষায় ও শব্দবিন্যাসে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। বিষয়ের গুরুত্ব-হেতু সুপ্তা সুন্দরীর রূপবর্ণনায় বঙ্কিমচন্দ্রকে বাধ্য হইয়া সেকেলে কাদম্বরী বা প্রথম স্তরের হালি কপাল-কুণ্ডলার গুরুগম্ভীর সাগর-আরাবী ভাষার ছায়া অবলম্বন করিতে হইয়াছে, নতুবা সেই সৌন্দর্য

দেখিয়া চন্দ্রশেখরের সঙ্গে সঙ্গে পাঠকের 'চক্ষে অশ্রু বহে' না।

'সেই গম্ভীরনাদী বারিধিতীরে, সৈকত-ভূমে, অস্পষ্ট সন্ধ্যালোকে দাঁড়াইয়া অপূর্ব রমণীমূর্তি! কেশভার অবেণী-সংবদ্ধ, সংসর্পিত, রাশীকৃত—আগুল্‌ফ-লম্বিত কেশভার; তদগ্রে দেহরত্ন—যেন চিত্রপটের উপর চিত্র দেখা যাইতেছে। অলকাবলীর প্রাচুর্যে মুখমণ্ডল সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ হইতেছিল না, তথাপি মেঘাবচ্ছেদ-নিঃসৃত চন্দ্ররশ্মির ন্যায় প্রতীত হইতেছিল। বিশাল লোচনে কটাক্ষ—অতিস্থির, অতিস্নিগ্ধ, অতি-গম্ভীর অথচ জ্যোতির্ময়; সে কটাক্ষ এই সাগর-হৃদয়ে ক্রীড়াশীল চন্দ্রকিরণ-লেখার ন্যায় স্নিগ্ধোজ্জ্বল দীপ্তি পাইতেছিল। কেশরাশিতে স্কন্ধদেশ ও বাহুযুগল আচ্ছন্ন করিয়াছিল। স্কন্ধদেশ একে-

বারে অদৃশ্য; বাহুযুগলের বিমলশ্রী কিছু কিছু দেখা যাইতেছিল। রমণীদেহ একেবারে নিরাভরণ। মূর্তিমধ্যে যে একটি মোহিনী শক্তি ছিল, তাহা বর্ণিতে পারা যায় না। অর্ধচন্দ্র-নিঃসৃত কৌমুদী-বর্ণ; ঘনকৃষ্ণ চিকুরজাল,—পরস্পরের সান্নিধ্যে কি বর্ণ, কি চিকুর উভয়েরই যে শ্রী বিকসিত হইতেছিল, তাহা সেই গম্ভীরনাদী সাগরকূলে, সন্ধ্যালোকে না দেখিলে তাহার মোহিনী শক্তি অনুভূত হয় না।'

কপালকুণ্ডলার এই আগুল্‌ফলম্বিত কেশভারের বর্ণনার সহিত ইভের অলকাবলি-বর্ণনায় নিম্নে উদ্ধৃত মিল্‌টনের চারিটি পঙ্‌ক্তি পাঠ করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, ভাবের অভিব্যক্তির খাতিরে ভাষায় জোর দিবার জন্য ভাষাকে শব্দ-সম্পদে ইচ্ছাকৃত ভারাক্রান্ত করিতে হইয়াছে।

She, as a veil down to the slender waist,
Her unadornèd golden tresses wore
Dishevelled, but in wanton ringlets waved
As the vine curls her tendrils.

নিস্তব্ধ নিশীথের তৃতীয় যামে শাস্ত্রানুশীলনে ব্যস্ত ও উন্মত্ত ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের দৃষ্টিভঙ্গিতে বিবাহিতা সুপ্তা সুন্দরীর রূপের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া সাহিত্যের সপ্তাশ্বকে স্বতঃই অশ্বরশ্মি আল্‌গা দিতে হইয়াছে, আর তাঁহার ঘোড়াগুলি প্রত্যেকে ছাড়তোকে চার পা তুলিয়া লাফাইয়া লাফাইয়া, আকাশ-বাতাস ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত করিতে করিতে তীরবেগে ছুটিয়া চলিয়াছে।

আমরা যেন অশ্বপদধ্বনির তালে তালে চন্দ্র-শেখরের হৃৎপিণ্ডের দ্রুত গতির প্রবল স্পন্দন শুনিতে পাইতেছি,—আমরা যেন ব্রাহ্মণের হৃদয়োত্থিত প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাবাতের দ্রুততর বেগ ও প্রবলতর কম্পন উপলব্ধি করিতে পারিতেছি। চন্দ্রশেখরের ঘন ঘন বুকফাটা দীর্ঘনিঃশ্বাসের সহিত আমরা যেন তাঁহার সেই মর্মন্তুদ শোকাবহ উক্তি স্পষ্টাক্ষরে শুনিতে পাইতেছি—

'এই সুকুমার কুসুমকে কি অতৃপ্ত যৌবনতাপে দগ্ধ করিবার জন্যই বৃন্তচ্যুত করিয়াছিলাম ?'

আর রোহিণী সুন্দরী সাজিয়া-গুজিয়া, কেশবেশ-বিন্যাস করিয়া, হেলিয়া-দুলিয়া জল আনিতে চলিয়াছেন,—তাঁহার চলনের দোলনে কক্ষস্থিত পিতলের ভারী কলসী ধীরে ধীরে নাচিতেছে, আর সঙ্গে সঙ্গে, যেমন তরঙ্গে তরঙ্গে হংসী নাচে, ভাষাও তেমনি ধীরে ধীরে গা দোলাইয়া নাচিয়া নাচিয়া চলিয়াছে। এইরূপ onomatopœia বা sound echoing the sense বা ভাষার মধ্যে ধ্বন্যাত্মক শব্দসমাবেশ বাস্তবিকই বাঙ্গালা গদ্য-সাহিত্যে দুর্লভ।

রোহিণীর বেশভূষার, রোহিণীর চালচলনের, রোহিণীর হাবভাবের বিবৃতি পাঠ করিলেই তাহার ভিতরকার সবটুকু পাঠকের চোখের সামনে জ্বল্‌জ্বল করিয়া ভাসিয়া উঠে। ইহাই ওস্তাদ কারিকরের কারুশিল্প-বৈশিষ্ট্যের প্রকৃষ্ট নিদর্শন।

বলিতে ইচ্ছা করে, তোমারি তুলনা তুমি এ মহীমণ্ডলে। সার্থক তোমার লেখনী-ধারণ,

ধন্য তোমার ভাষার উপর একাধিপত্য-স্থাপন, আর বলিহারি তোমার রস-মাধুর্য-বোধ !

চোদ্দ

কৃষ্ণকান্তের উইল ১৮৭৭ সালে লেখা। পর-বৎসরে বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালা (লিখিবার) ভাষা বিষয়ক একটি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ লেখেন। ইহার কিয়দংশ উদ্ধার করিতেছি—আমার তরুণ পাঠকগণ মাপ করিবেন। তাঁহারা বলিবেন, রসভঙ্গ করিতেছি, কিন্তু আমি উত্তরে বলিব, রসগ্রহণের পক্ষে, পরিপক্ব লেখকের রচনা-বৈশিষ্ট্যের নিয়ম ও বিধানগুলি বুঝিবার পক্ষে, তাঁহার লিখিত রচনার অংশবিশেষ বিশেষরূপে সহায়তা করিবে।

বাঙ্গালা ভাষা, ১৮৭৮

(লিখিবার ভাষা)

অতএব ইহাই সিদ্ধান্ত করিতে হইতেছে যে, বিষয়-অনুসারেই রচনার

ভাষার উচ্চতা বা সামান্যতা নির্ধারিত হওয়া উচিত। রচনার প্রধান গুণ এবং প্রধান প্রয়োজন,—সরলতা এবং স্পষ্টতা। যে রচনা সকলেই বুঝিতে পারে এবং পড়িবামাত্র যাহার অর্থ বুঝা যায়, অর্থ-গৌরব থাকিলে তাহাই সর্বোৎকৃষ্ট রচনা। তাহার পর ভাষার সৌন্দর্য,—সরলতা এবং স্পষ্টতার সহিত সৌন্দর্য মিশাইতে হইবে। অনেক রচনার মুখ্য উদ্দেশ্য সৌন্দর্য—সে স্থলে সৌন্দর্যের অনুরোধে শব্দের একটু অসাধারণতা সহ্য করিতে হয়।

প্রথমে দেখিবে, তুমি যাহা বলিতে চাও, কোন্ ভাষায় তাহা সর্বাপেক্ষা পরিষ্কাররূপে ব্যক্ত হয়। যদি সরল প্রচলিত কথাবার্তার ভাষায় তাহা সর্বাপেক্ষা সুস্পষ্ট এবং সুন্দর হয়, তবে

কেন উচ্চ ভাষার আশ্রয় লইবে? যদি সে পক্ষে টেকচাঁদী বা হুতোমী ভাষায় সকলের অপেক্ষা কার্য সুসিদ্ধ হয়, তবে তাহাই ব্যবহার করিবে। যদি তদপেক্ষা বিদ্যাসাগর- বা ভূদেববাবু-প্রদর্শিত সংস্কৃত-বহুল ভাষায় ভাবের অধিক স্পষ্টতা এবং সৌন্দর্য হয়, তবে সামান্য ভাষা ছাড়িয়া সেই ভাষার আশ্রয় লইবে। যদি তাহাতেও কার্যসিদ্ধি না হয়, আরও উপরে উঠিবে। প্রয়োজন হইলে তাহাতেও আপত্তি নাই—নিষ্প্রয়োজনেই আপত্তি। বলিবার কথাগুলি পরিস্ফুট করিয়া বলিতে হইবে। যতটুকু বলিবার আছে, সবটুকু বলিবে—তজ্জন্য ইংরাজি, ফার্সি, আরবী, সংস্কৃত, গ্রাম্য, বন্য—যে ভাষার শব্দ প্রয়োজন, তাহা গ্রহণ করিবে, অশ্লীল ভিন্ন কাহাকেও ছাড়িবে না।

তাহার পর সেই রচনাকে সৌন্দর্য-

বিশিষ্ট করিবে, কেন-না যাহা অসুন্দর মনুষ্য-চিত্তের উপরে তাহার শক্তি অল্প। এই উদ্দেশ্যগুলি যাহাতে সরল প্রচলিত ভাষায় সিদ্ধ হয়, সেই চেষ্টা দেখিবে— লেখক যদি লিখিতে জানেন, তবে সে চেষ্টা প্রায় সফল হইবে। আমরা দেখিয়াছি, সরল প্রচলিত ভাষা অনেক বিষয়ে সংস্কৃতবহুল ভাষার অপেক্ষা শক্তিমতী। কিন্তু যদি সে সরল প্রচলিত ভাষায় সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হয়, তবে কাজে কাজেই সংস্কৃতবহুল ভাষার আশ্রয় লইতে হইবে। প্রয়োজন হইলে নিঃসঙ্কোচে সে আশ্রয় লইবে।

ইহাই আমার বিবেচনায় বাঙ্গালা রচনার উৎকৃষ্ট রীতি।.........এই রীতি অবলম্বন করিলে, আমাদিগের বিবেচনায় ভাষা শক্তিশালিনী, শব্দৈশ্বর্যে পুষ্টা এবং সাহিত্যালঙ্কারে বিভূষিতা হইবে।

পনেরো

১২

মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত, ১৮৮০

ভদ্রকালী

ভদ্রকালীর দ্বাদশবৎসর বয়সে বিবাহ হয়—মুচিরামের এমনই অদৃষ্ট—বিবাহের পর দুই বৎসরের মধ্যেই ভদ্রকালী চৌদ্দ বৎসরের হইল। চৌদ্দ বৎসরের হইয়াই ভদ্রকালী ভজগোবিন্দের একটি চাকরীর জন্য মুচিরামের উপর দৌরাত্ম্য আরম্ভ করিল।

এই সংক্ষিপ্ত, সরল, সরস টিপ্পনীর উপর মন্তব্য অনাবশ্যক। পাঠককে মনে করাইয়া দিতে হইবে কি, যে মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত গণিতশাস্ত্রের সঙ্কলন-অধ্যায়ের উদাহরণ-স্বরূপ লিখিত হয় নাই, যে ১২ + ২ = ১৪ বুঝাইবার উদ্দেশ্যে বঙ্কিমচন্দ্র কখনও

লেখনী ধারণ করেন নাই? তবে?—বুঝ লোক যে জান সন্ধান। যৌবনে এই অংশটুকু পড়িবা-মাত্র বঙ্কিমচন্দ্রের গণিত-জ্ঞানের সম্যক্ পরিচয় পাওযায় হাসির চোটে আমার কিন্তু দম বন্ধ হইবার জোগাড় হইয়াছিল। **Brevity is the soul of wit**—রস যত দানা বাঁধে ততই রসনার তৃপ্তিকর হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের গণিত-জ্ঞানের আর একটি প্রমাণ দিতেছি।

'হীরাকে সূর্যমুখীর আসনে বসাইলে হীরা কি খলকপট থাকিত? হীরা বলে, "না"। হীরাকে হীরার আসনে বসাইয়াছে বলিয়াই হীরা, হীরা। লোকে বলে, "সকলই দুষ্টের দোষ।" দুষ্ট বলে, "আমি ভালমানুষ হইতাম—কিন্তু লোকের দোষে দুষ্ট হইয়াছি।" লোকে বলে, "পাঁচ কেন সাত হইল না?" পাঁচ বলে, "আমি সাত হইতাম —কিন্তু দুই আর পাঁচে সাত—বিধাতা

অথবা বিধাতার সৃষ্ট লোকে যদি আমাকে আর দুই দিত, তা হ'লেই আমি সাত হইতাম।" হীরা তাহাই ভাবিতেছিল।'

বঙ্কিমচন্দ্র দুইয়ের বেশি যোগ দিতে জানিতেন না!

ষোল

১৩

আনন্দমঠ, ১৮৮১

কল্যাণী

কাহার মুখ তাহা জানি না, কিন্তু মুখখানা বড সুন্দর,—কৃষ্ণকুঞ্চিত সুগন্ধি অলকারাশি আকর্ণপ্রসারী ভ্রূযুগের উপর পড়িয়া আছে, মধ্যে অনিন্দ্য ত্রিকোণ ললাটদেশ মৃত্যুর করাল-কালচ্ছায়ায় গাহমান হইয়াছে; যেন সেখানে মৃত্যু ও

মৃত্যুঞ্জয় দ্বন্দ্ব করিতেছে। নয়ন মুদ্রিত, ভ্রূযুগ স্থির, ওষ্ঠ নীল, গণ্ড পাণ্ডুর, নাসা শীতল, বক্ষ উন্নত, বায়ু বসন বিক্ষিপ্ত করিতেছে। তারপর যেমন করিয়া শরন্মেঘ-বিলুপ্ত চন্দ্রমা ক্রমে ক্রমে মেঘ-দল উদ্ভাসিত করিয়া আপনার সৌন্দর্য বিকশিত করে, যেমন করিয়া প্রভাতসূর্য তরঙ্গাকৃতি মেঘমালাকে ক্রমে ক্রমে সুবর্ণীকৃত করিয়া আপনি প্রদীপ্ত হয়, দিঙ্মণ্ডল আলোকিত করে, স্থলজল কীটপতঙ্গ প্রফুল্ল করে, তেমনি সেই শবদেহে জীবনের শোভার সঞ্চার হইতে-ছিল। আহা, কি শোভা!—ভবানন্দ তাই ভাবিতেছিল।

বিষয়-অনুসারেই রচনার ভাষার উচ্চতা বা সামান্যতা নির্ধারিত হওয়া উচিত—লিখিবার ভাষা-সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের এই প্রথম সিদ্ধান্ত কল্যাণীর 'বড় সুন্দর' মুখখানির বর্ণনায় অক্ষরে

অক্ষরে প্রতিপালিত হইয়াছে। ভাষার রাজাধিরাজ বিধান দিয়াছেন, ভাষার উচ্চতা বা সামান্যতা নির্ধারিত হওয়ার পর, উহাকে সরলতা ও সুস্পষ্টতায় ওতপ্রোত করিয়া উহার সহিত সৌন্দর্য মিশাইতে হইবে। তাই বিষ-সেবনে মৃতপ্রায় কল্যাণীর অনবদ্য দেহের উপর যখন মৃত্যু ও মৃত্যুঞ্জয়ের দ্বন্দ্বযুদ্ধ চলিতেছিল, তখন তাহার কমনীয় মুখমাধুর্য বর্ণনা করিতে গিয়া আবার এতকাল পরে বঙ্কিমচন্দ্রকে সিন্ধুরাব-গম্ভীরনাদী শব্দসমূহের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছে—নহিলে ভাবের সহিত ভাষার দ্যোতনার সামঞ্জস্য-সাধন ঘটে না।

এইরূপ গুরুগম্ভীর ভাষার শরণ না লইলে, যে সেই বড়সুন্দর মুখখানি ভাবিতেছিল, আর যাহার সেই বড়সুন্দর মুখখানি ভাবনার বিষয় হইয়াছিল—উভয়ের প্রতিই কবির অযথা অবিচার করা হইত। চুট্‌কি কথায়, ছোট ছোট চল্‌তি শব্দের সমাবেশে ভবানন্দের পরস্ত্রীর মুখ-চিন্তা বর্ণনা করিলে সেই দিনই, তদ্দণ্ডেই, সেই মুহূর্তেই তাহার সন্তানধর্ম, তাহার ব্রহ্মচর্য, তাহার আত্মসংযম—সব যে অতলে ডুবিয়া যাইত।

মনে রাখিতে হইবে, চিন্তামগ্ন কে? না—সন্তানধর্মী, ব্রহ্মচর্যপরায়ণ, সংসারত্যাগী, কল্যাণীর প্রাণদাতা ভবানন্দ। চিন্তার স্থান ও কাল কোথায়? না—রাত্রিতে আনন্দমঠের নিভৃত নিলয়ে। চিন্তার বিষয় কি? না—যাহার মৃতদেহে পুনর্জীবন সঞ্চার করিয়া অর্দ্ধজীবিত দেহ অশ্বপৃষ্ঠে তুলিয়া লইয়া বনের ভিতর হইতে নগরে বাহিত হইযাছিল, সেই সুন্দরী ললনাব সেই বড়সুন্দর মুখখানি।

এই সব স্থান, কাল, পাত্র, পাত্রী, বিষয়-বস্তু প্রভৃতি বিচারপূর্বক বঙ্কিমচন্দ্রকে শব্দৈশ্বর্যশালিনী সংস্কৃত ভাষার সাহায্য গ্রহণ করিতে হইয়াছিল,—তখন কুসুমে কীট প্রবেশ করিয়াছে মাত্র,—পূত প্রস্ফুটিত পুষ্পটিকে কুরিয়া কুরিয়া খাইয়া একেবারে ফোঁপরা কবিযা ফেলে নাই,—ফেলিলে কবি চুট্‌কি ভাষায, নাচনি ছন্দে, আদিরস-সংযোগে ভবানন্দকে পরপত্নীর মুখখানি তন্ময়চিত্তে ভাবিতে বসাইতেন। বঙ্গিমচন্দ্রের অমর লেখনীতে সেরূপ শক্তি যথেষ্ট পরিমাণেই ছিল।

বচনার এই অংশের মুখ্য উদ্দেশ্যই সৌন্দর্য-সাধন,

অর্থাৎ করুণরস হইতে অতি সঙ্গোপনে ধীরে ধীরে চুপি চুপি আদিরসের অঙ্কুরোৎপাদন। কাজেই এ স্থলে সৌন্দর্যের অনুরোধে শব্দের একটু অসাধারণতা, বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায়, আমাদিগকে 'সহ্য' করিতে হয়,—কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে, আমাদের ভাষায়, মুক্তকণ্ঠে বলিতে বাধ্য হই—প্রাণমন ভরিয়া ভাষা তথা শব্দের এই অসাধারণতা 'উপভোগ' করিবার সুযোগ পাইয়া আমরা ধন্য হই।

আবার সেই আনন্দমঠেই শান্তির সৌন্দর্য-বিশ্লেষণ করিতে গিয়া বঙ্গসাহিত্যের শাহানশা-সম্রাট্ একটিও সংস্কৃত সমস্ত পদের শরণ লন নাই—এই বর্ণনার আগাগোড়া খাঁটি বাঙ্গালা শব্দের ছড়াছড়ি,—এমন কি 'নির্বাণপ্রায় অগ্নির' পরিবর্তে 'প্রায়-নিবান আগুন' লিখিতে তিনি একটুও কিন্তু হন নাই। এখন যে ওস্তাদ বাজীকরের যাদুদণ্ড-হেলনে ভাষা নানানতর সাতসতেরো ভেল্‌কি দেখাইতেছে।

শাস্তি

মলিন গ্রন্থিযুক্ত বসন পরিয়া সেই গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল, বোধ হইল, যেন গৃহে আলো হইল। বোধ হইল, পাতায় ঢাকা কোন গাছে কত ফুলের কুঁড়ি ছিল, হঠাৎ ফুটিয়া উঠিল; বোধ হইল, যেন কোথাও গোলাপ জলের কার্বা মুখ-আঁটা ছিল, কে কার্বা ভাঙ্গিয়া ফেলিল; যেন কে প্রায়-নিবান আগুনে ধূপ ধূনা গুগ্‌গুল ফেলিয়া দিল।

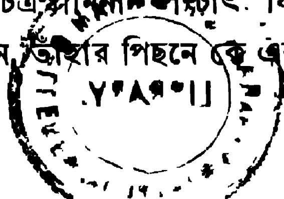
এরূপ বর্ণনা বঙ্গসাহিত্যে দুর্লভ।

১৪

রাজসিংহ, ১৮৮২

চঞ্চলকুমারী

চিত্রশালিনী পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলেন, তাঁহার পিছনে কে একখানি দেবী-



প্রতিমা দাঁড় করাইয়া দিয়াছে। বৃদ্ধা অনিমেষলোচনে সেই সর্বশোভাময়ী-ধবল-প্রস্তরনির্মিত-প্রায় প্রতিমা-পানে চাহিয়া রহিল—কি সুন্দর; বুড়ী বয়োদোষে একটু চোখে খাট, তত পরিষ্কার দেখিতে পায় না—তাহা না হইলে দেখিতে পাইত যে, এ ত প্রস্তরের বর্ণ নহে; নির্জীবের এমন সুন্দর বর্ণ হয় না। পাথর দূরে থাকুক কুসুমেও এ চারুবর্ণ পাওয়া যায় না। দেখিতে দেখিতে বৃদ্ধা দেখিল যে, প্রতিমা মৃদু-মৃদু হাসিতেছে। পুতুল. কি হাসে? বুড়ী তখন মনে মনে ভাবিতে লাগিল, এ বুঝি পুতুল নয়—ঐ অতিদীর্ঘ, কৃষ্ণ-তার, চঞ্চল, সজল বৃহচ্চক্ষুর্দ্বয় তাহাব দিকে চাহিয়া হাসিতেছে। বুড়ী তখন সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত কবিল। এ প্রণাম রাজকুলকে নহে এ প্রণাম সৌন্দর্যকে।

বুড়ী যে সৌন্দর্য দেখিল, তাহা দেখিয়া প্রণত হইতে হয়।

এইখানে দ্বিতীয় স্তরের সমাপ্তি এবং শেষ স্তরের সূচনা।



ভাষার তৃতীয় বা শেষ স্তর

(১৮৮২—১৮৯৩)

সতেরো

বঙ্কিমচন্দ্রের নিজের ভাষা-সম্বন্ধে তাঁহার নিজের উক্তি রাজসিংহের চতুর্থ সংস্করণের 'বিজ্ঞাপন' হইতে শেষ স্তরের ভূমিকারূপে উদ্ধৃত করাই সমীচীন বলিয়া মনে করি। তিনি লিখিয়াছেন,—

'এখন লেখকেরা বা ভাষা-সমালোচকেরা দুই ভাগে বিভক্ত। এক সম্প্রদায়ের মত যে, বাঙ্গালা ব্যাকরণ সর্বত্র সংস্কৃতানুযায়ী হওয়া উচিত। দ্বিতীয় সম্প্রদায়ের মত—তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই সংস্কৃতে পণ্ডিত—যে, যাহা পূর্ব হইতে চলিয়া আসিয়াছে, তাহা সংস্কৃত ব্যাকরণ-বিরুদ্ধ হইলেও চলিতে পারে। আমি নিজে এই দ্বিতীয়

সম্প্রদায়ের মতের পক্ষপাতী, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে সকল স্থানে তাঁহাদের অনুমোদনে প্রস্তুত নই। আমি যদিও ইতিপূর্বে সম্বোধনে "ভগবন্" "প্রভো" "স্বামিন্" "রাজকুমারি" "পিতঃ" প্রভৃতি লিখিয়াছি,—এক্ষণে এ সকল বাঙ্গালা ভাষায় অপ্রযোজ্য বলিয়া পরিত্যাগ করিয়াছি। আমি "তথা" এবং "তথায়" উভয় রূপই ব্যবহার করিয়াছি। "সসৈন্যে" এবং "সসৈন্য" দুই-ই লিখিয়াছি, একটু অর্থ-প্রভেদে। কিন্তু "গোপিনী" "সশরীরে উপস্থিত" —এইরূপ প্রয়োগ পরিত্যাগ করিয়াছি।'

সাহিত্য-সম্রাটের এই যুক্তিযুক্ত সারগর্ভ উপদেশ ও অভিজ্ঞতাপ্রসূত আদেশ ভাল করিয়া পাঠ করিলে স্বতঃই প্রতীয়মান হয় যে, তিনি তাঁহার নিজের পাঁতি বা বিধানগুলি তাঁহার পরবর্তী রচনায় সর্বতোভাবে পালন করিয়াছিলেন। ১৮৮১

সালে প্রকাশিত আনন্দমঠই ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। আর ১৮৮২ সালে লিখিত দেবী চৌধুরাণী হইতে, অর্থাৎ তাঁহার ভাষার তৃতীয় বা শেষ স্তরের প্রথম পুস্তক হইতে আরম্ভ করিয়া তাঁহার ইহলোক হইতে তিরোভাব পর্যন্ত তিনি যাহা কিছু লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, উহাদের সকলগুলিকেই তাঁহার নির্দেশিত ভাষার খাদ-যাচাই করিবার কষ্টিপাথরে কষিয়া দেখিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, সেগুলির প্রত্যেকটিই নিখাদ খাঁটি সোণা, কষিত কনককান্তি কমনীয় কায়—বঙ্গসাহিত্যে 'আদর্শ' ভাষার নিদর্শন।

এই শেষ স্তরের সম্বন্ধে আমার বেশি কিছু বলিবার নাই—প্রত্যেক রচনা ও বর্ণনার মধ্যে তাঁহার স্বনির্দিষ্ট বিধানগুলি পরিস্ফুট হইয়া, মূর্তি-পরিগ্রহ করিয়া ভাষাকে জীবন্ত, প্রাণবন্ত ও প্রদীপ্ত করিয়া তুলিয়াছে।

'বঙ্গভারতী বাণীমাতা আমার অনন্তরূপিণী। তুমি যে ভাবে তাঁহার পূজা করিবে, সেই ভাবেই সিদ্ধিলাভ করিবে। যখন যে লক্ষ্যে ভাষাপ্রয়োগের প্রয়োজন, ভাষাকে সেই লক্ষ্য-সিদ্ধির উপযোগিনী

করিতে হইবে। আমাদের পরম সৌভাগ্য যে, আমরা বাঙ্গালা ভাষাকে সেইরূপ তুলিতে-পাড়িতে পারি। কিন্তু তাহাতে সাধনা চাই, কায়মনঃপ্রাণে মাতৃভাষার সেবা করা চাই। সেবাধর্মের গুণই এই যে, ঐকান্তিক সেবক সেবার বলে সেবিতকে আপনার বশে আনিতে পারে। সকলেই দেখিয়া থাকিবে, পুরাতন ভৃত্য ধারাবাহিক সেবার গুণে প্রভুকে আপনার বশে রাখে।'

বঙ্কিমচন্দ্র আবাল্য সাহিত্যসেবী। তাঁহার প্রথম গ্রন্থ 'ললিতা। পুরাকালিক গল্প। তথা মানস।' ১৮৫৩ সালে তাঁহার 'পঞ্চদশ বৎসর বয়সে লিখিত হয়।' আর তাঁহার লেখার এই শেষ স্তরের সূচনা ১৮৮২ সালে। এই ত্রিশ বৎসর ধরিয়া কায়মনঃপ্রাণে মাতৃভাষার সেবা করিয়া তিনি ভাষাজননীকে সম্পূর্ণরূপে নিজের বশে আনিতে পারিয়াছিলেন—তাঁহার অঙ্গুলি-সঞ্চালনে, তাঁহার ইঙ্গিতে, তিনি তাঁহার ইচ্ছামত, ভাষাকে তুলিতে-পাড়িতে ছিলেন। তখন তিনি ও তাঁহার ভাষার মধ্যে সেবক ও সেবিতার ভাব ছিল না—ছিল সম্পূর্ণ একাত্মতা, হরিহর আত্মা, অভিন্নতা।

জ্ঞানী, গুণী, কৃতী, বিদ্বান্, বুদ্ধিমান্, বিচক্ষণ,—ধীর, স্থির, বিনয়ী, আজ্ঞানুবর্তী, আদেশপ্রত্যাশী, একান্ত অনুরাগী,—সতত সেবারত সাবালক সন্তান, প্রাচীনা, প্রবীণা, প্রৌঢ়া জননীর কাছে যাহা কিছু আবদার করে, যাহা কিছু চাহিয়া বসে, যাহা কিছু নিবেদন করে, সেইগুলি পূরণ করিতে তাঁহার অনুমাত্র বিলম্ব হয় না, একটুও তর সহে না—তখন ফুলিয়া উঠে মায়ের বুক, আবার ঝরিতে থাকে স্তন্যধারা, চক্ষে টল্‌টল করে আনন্দের অশ্রু—উপযুক্ত সন্তানের স্নেহের এই দাবিদাওয়া মিটাইতে গিয়া!

তখন বঙ্কিমচন্দ্রের সেবাগুণে তাঁহার বর্ষীয়সী প্রৌঢ়া, প্রাচীনা ভাষা প্রবীণা গৃহকর্ত্রীর ন্যায় সংসারের সর্বত্র সমদৃষ্টি-সম্পন্না, সকলের কল্যাণকার্যে যত্নশীলা,—শ্রদ্ধা-ভক্তিতে, আদর-আপ্যায়নে, সেবা-শুশ্রূষায়, স্নেহে-সোহাগে, ব্যঙ্গ-কৌতুকে, রঙ্গ-রসে, মিষ্টমধুর ভর্ৎসনায় ছেলেবুড়, ঝিউড়িবধূ, দাসদাসী, এমন কি গৃহপালিত গাভীকেও আপন করিয়া লইয়া সকলের শ্রদ্ধাকর্ষণপূর্বক সাক্ষাৎ মাতৃকামূর্তি পরিগ্রহ করিয়াছেন!

আঠারো

১৫

দেবী চৌধুরাণী, ১৮৮২

দেবীরাণী

গালিচার উপর বসিয়া একজন স্ত্রালোক। তাহার বয়স্ অনুমান করা ভার—পঁচিশ বৎসরের নীচে তেমন পূর্ণায়ত দেহ দেখা যায় না; পঁচিশ বৎসরের উপর তেমন যৌবনের লাবণ্য কোথাও পাওয়া যায় না। বয়স্ যাহাই হউক—সে স্ত্রীলোক পরমা সুন্দরী, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এ সুন্দরী কৃশাঙ্গী নহে—অথবা স্থূলাঙ্গী বলিলেও ইহার নিন্দা হইবে। বস্তুতঃ ইহার অবয়ব সর্বত্র ষোলকলা-সম্পূর্ণ—আজি ত্রিস্রোতা যেমন কূলে কূলে পূরিয়াছে—ইহারও শরীর তেমনই কূলে কূলে

পূরিয়াছে। তাহার উপর বিলক্ষণ উন্নত দেহ। দেহ তেমন উন্নত বলিয়াই, স্থূলাঙ্গী বলিতে পারিলাম না। যৌবন-বর্ষার চারি পোয়া বন্যার জল, সে কমনীয় আধারে ধরিয়াছে—ছাপায় নাই। কিন্তু জল কূলে কূলে পূরিয়া টল-টল করিতেছে—অস্থির হইয়াছে। জল অস্থির, কিন্তু নদী অস্থির নহে,—নিস্তরঙ্গ। লাবণ্য চঞ্চল, কিন্তু সে লাবণ্যময়ী চঞ্চলা নহে—নির্বিকার। সে শান্ত, গম্ভীর, মধুর, অথচ আনন্দময়ী; সেই জ্যোৎস্নাময়ী নদীর অনুসঙ্গিনী। সেই নদীর মত সেই সুন্দরীও বড় সুসজ্জিতা। এখন ঢাকাই কাপড়ের তত মর্যাদা নাই—কিন্তু একশত বৎসর আগে কাপড়ও ভাল হইত, উপযুক্ত মর্যাদাও ছিল। ইহার পরিধানে একখানি পরিষ্কার মিহি ঢাকাই, তাহাতে

জরির ফুল। তাহার ভিতর হীরা-মুক্তা-খচিত কাঁচলি ঝক্‌মক করিতেছে। হীরা, পান্না, মতি, সোণায় সেই পরিপূর্ণ দেহ মণ্ডিত; জ্যোৎস্নার আলোকে বড় ঝক্‌-মক করিতেছে। নদীর জলে যেমন চিকিমিকি—এই শরীরেও তাহাই। জ্যোৎস্নাপুলকিত স্থির নদী-জলের মত —সেই শুভ্র বসন; আর জলে মাঝে মাঝে যেমন জ্যোৎস্নার চিকিমিকি—ঝিকিমিকি—শুভ্র বসনের মাঝে মাঝে তেমনই হীরা, মুক্তা, মতির চিকিমিকি। আবার নদীর যেমন তীরবর্তী বনচ্ছায়া, ইহারও তেমনই অন্ধকার কেশরাশি আলুলায়িত হইয়া অঙ্গের উপর পড়িয়াছে,—কোঁকড়াইয়া, ঘুরিয়া ঘুরিয়া, ফিরিয়া ফিরিয়া, গোছায় গোছায় কেশ পৃষ্ঠে, অংসে, বাহুতে, বক্ষে পড়িয়াছে; তাহার মসৃণ কোমল প্রতান-উপর

চাঁদের আলো খেলা করিতেছে; তাহার সুগন্ধিচূর্ণ গন্ধে গগন পরিপূরিত হইয়াছে। এক ছড়া যূঁইফুলের গোড়ে সেই কেশ-রাশি সংবেষ্টন করিতেছে।

উনিশ

এইবার রমণীর রূপবর্ণনা ছাড়িয়া দিয়া আমাকে পুনরায় বিষয়ান্তরের অবতারণা করিতে হইতেছে। আবার বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধ হইতে ভাষার নমুনা দেখাইতে হইবে।

১৮৮৫ সালে বঙ্কিমচন্দ্র ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিতা-বলি সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করেন। এই কাব্য-সঙ্কলনের ভূমিকাস্বরূপ তিনি 'ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনচরিত ও কবিত্ববিষযক প্রবন্ধ' অভিধেয় একটি উপাদেয় রচনা লেখেন।

সেই সুদীর্ঘ রচনার গোড়া হইতে আমি কয়েক পঙ্‌ক্তি উদ্ধার করিতেছি। ইহা নারীর রূপবর্ণনা নয় বটে, কিন্তু এই অংশটিকে তাঁহার নিজের 'চিত্তশ্রী'র, স্বীয় 'শ্রী-মতি'র সময়োপযোগী স্বরূপ

আলেখ্য স্বচ্ছন্দে বলা যাইতে পারে। পারিপার্শ্বিক নৈসর্গিক দৃশ্যাবলির মধ্যে তন্ময় হইয়া গিয়া তাঁহার চিত্তশ্রী যে কমনীয় কাব্যরাজ্যে উপনীত হইয়াছিল, তাঁহার তখনকার শ্রী-মতির অপূর্ব সুষমার মাধুর্য-বিশ্লেষণ বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার অনন্যসাধারণ তূলিকা-সম্পাতে চিত্রিত করিয়া গিয়াছেন। ভাবের দ্যোতনায়, ভাষার ব্যঞ্জনায় আর বিবৃতির নিপুণতায় এই অংশ, শুধু বাঙ্গালা সাহিত্যে নহে, যে কোনও সাহিত্যের পক্ষে গৌরবের সামগ্রী—প্রকৃতই স্পর্ধা করিবার বস্তু।

ভাষার অতুল্য গুণপনায় ভাবের সুরটি আপনা হইতে পাঠকের মনের ভিতর তলায় যে গোপন তারটি আছে, সেখানে মৃদুমন্দ আঘাত করিতে করিতে তাহার সারা প্রাণ, মন, দেহ বিচলিত, আন্দোলিত—আলোড়িত করিয়া তোলে। প্রাণ পুলক-কম্পনে নাচিয়া উঠে, শিল্পীর প্রতি শ্রদ্ধায় হৃদয় ভরিয়া যায়, আর সঙ্গে সঙ্গে ভক্তির ভারে মাথা নত হইয়া পড়ে।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনচরিত ও কবিত্ব

১৮৮৫

'শ্রীমতি'

একদিন বর্ষাকালে গঙ্গাতীরস্থ (চুঁচুড়ায়) কোন ভবনে বসিয়াছিলাম। প্রদোষকাল—প্রস্ফুটিত চন্দ্রালোকে বিশাল বিস্তীর্ণ ভাগীরথী লক্ষবীচি-বিক্ষেপ-শালিনী—মৃদু পবনহিল্লোলে তরঙ্গভঙ্গ-চঞ্চল চন্দ্রকরমালা লক্ষ তারকার মত ফুটিতেছিল ও নিবিতেছিল। যে বারেণ্ডায় বসিয়াছিলাম, তাহার নীচে দিয়া বর্ষার তীব্রগামী বারিরাশি মৃদুরব করিয়া ছুটিতেছিল। আকাশে নক্ষত্র, নদীবক্ষে নৌকায় আলো, তরঙ্গে চন্দ্র-রশ্মি। কাব্যের রাজ্য উপস্থিত হইল। মনে করিলাম, কবিতা পড়িয়া মনের তৃপ্তিসাধন করি। ইংরেজি কবিতায়

তাহা হইল না। ইংরেজির সঙ্গে এ ভাগীরথীর ত কিছুই মিলে না। কালিদাস-ভবভূতিও অনেক দূরে।

মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র— কাহাতেও তৃপ্তি হইল না। চুপ করিয়া রহিলাম। এমন সময়ে গঙ্গাবক্ষ হইতে মধুর সঙ্গীতধ্বনি শুনা গেল। জেলে জাল বাহিতে বা'হিতে গায়িতেছে—

সাধো আছে মা মনে—
দুর্গা ব'লে প্রাণ ত্যজিব
জাহ্নবী-জীবনে।

তখন প্রাণ জুড়াইল—মনের সুর মিলিল - বাঙ্গালা ভাষায় বাঙ্গালীর মনের আশা শুনিতে পাইলাম—এ জাহ্নবী-জীবন দুর্গা বলিয়া প্রাণ ত্যজিবারই বটে, তাহা বুঝিলাম। তখন সেই শোভাময়ী জাহ্নবী, সেই সৌন্দর্যময় জগৎ—সকলই

আপনার বলিয়া বোধ হইল—এতক্ষণ পরের বলিয়া বোধ হইতেছিল।

বিশ

পূর্বে বলিয়াছি যে, সীতারাম বঙ্কিমচন্দ্রের শেষ উপন্যাস। কথাটা একটু বুঝাইয়া বলা দরকার হইয়া পড়িয়াছে।

১৮৮৪ সালের প্রচারে সীতারাম দেখা দেয় এবং ১৮৮৭ সালে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। ইহার পূর্বেই ১৮৮২ সালে অবশ্য রাজসিংহ প্রকাশিত হইয়াছিল। আমি বলিতে চাই যে, রাজসিংহের পরেই সীতারামের প্রকাশ, আর সীতারামই বঙ্কিমচন্দ্রের শেষ উপন্যাস। এই সীতারামের সঙ্গে সঙ্গেই প্রচারে তিনি কৃষ্ণচরিত্রের আলোচনায় আত্মনিয়োগ করেন।

এত কথা এই ভাবে বলিবার তাৎপর্য এই যে, বঙ্কিমচন্দ্র রাজসিংহের বিজ্ঞাপনে লিখিয়াছেন,—

'পরিশেষে বক্তব্য যে, আমি পূর্বে কখন ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখি নাই।

দুর্গেশনন্দিনী বা চন্দ্রশেখর বা সীতারামকে ঐতিহাসিক বলা যাইতে পারে না। এই প্রথম ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখিলাম।'

এই অংশ পড়িয়া প্রথমে আমারও বিষম ধাঁধা লাগিয়াছিল—তবে কি সীতারাম রাজসিংহের আগে লেখা। তারপর দেখি যে, উহা রাজসিংহের চতুর্থ সংস্করণের বিজ্ঞাপন। এই সংস্করণের বহু পূর্বেই অবশ্য সীতারাম পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল।

আর এক কথা। প্রথম সংস্করণের রাজসিংহ ক্ষুদ্র একটি উপাখ্যান মাত্র, তাহাকে উপন্যাসই বলা চলে না। এই দুই কারণে বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন যে, রাজসিংহই অর্থাৎ 'বর্ধিতায়তন রাজসিংহ'-ই তাঁহার প্রথম ঐতিহাসিক উপন্যাস—দুর্গেশনন্দিনী বা চন্দ্রশেখর বা সীতারাম নহে।

এই শেষ উপন্যাস সীতারামের 'পরিশিষ্ট' হইতে শেষ কয়েক পঙ্‌ক্তি উদ্ধার করিয়া শেষ বারের মত রূপচ্ছবির ঝাঁপি খুলিব।

'আমাদের পূর্বপরিচিত বন্ধুদ্বয় রামচাঁদ ও শ্যামচাঁদ ইতিপূর্বেই পলাইয়া নলডাঙ্গায় বাস করিতেছিলেন। সেখানে একখানি আটচালায় বসিয়া কথোপকথন করিতেছেন। ...

শ্যাম। ... তা যাক গিয়ে, আমরা আদার ব্যাপারী, জাহাজের খবরে কাজ কি? আপনার আপনার প্রাণ নিয়ে যে বেঁচে এয়েছি, এই ঢের। এখন তামাকটা ঢেলে সাজ দেখি।

রামচাঁদ ও শ্যামচাঁদ তামাক ঢালিয়া সাজিয়া খাইতে থাকুন। আমরা ততক্ষণ গ্রন্থ সমাপন করি।'

সীতারামের ভাষা-বিষয়ে শুধু এইটুকু মাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, বঙ্কিমচন্দ্র দ্বিতীয় স্তরের প্রথম পুস্তকে—বিষবৃক্ষে—হাতের সুখে 'গোরু ঠেঙ্গাইতে' আরম্ভ করিয়াছিলেন, আর শ্রেষ্ঠ তথা শেষ স্তরের শেষ উপন্যাস সমাপ্ত করিয়া, বিষবৃক্ষের

তলায় বসিয়া 'তামাকু' খাওয়া ছাড়িয়া দিয়া, রামা-শামার সঙ্গে আটচালায় জমাটি করিয়া বসিয়া, পরমানন্দে মনের সুখে **তামাক ঢালিয়া সাজিয়া খাইতে লাগিলেন।**—কথা ভাষার জয়ধ্বনি ভেরী-নিনাদ-সহকারে আকাশ-বাতাস কাঁপাইয়া বিঘোষিত হইল! আসুন, সকলে মিলিয়া একবার জয়ধ্বনি করি।

একুশ

১৬

সীতারাম, ১৮৮৪

অশ্রুপূর্ণা শ্রী

শ্রী মুখের ঘোমটা তুলিল। সীতারাম দেখিলেন, অশ্রুপূর্ণা, বর্ষাবারি-নিষিক্ত পদ্মের ন্যায় অনিন্দ্য-সুন্দরমুখী। বলিলেন, "তুমি শ্রী! এত সুন্দরী!"

এই স্বল্প কয়েকটি কথায় অনিন্দ্য সুন্দরীর রূপমধুরিমার চিত্র আর কোথাও দেখি নাই।

পাঠক, মাপ করুন; পাঠিকা, দয়া করিয়া ক্ষমা করুন—প্রথম উপন্যাস দুর্গেশনন্দিনী হইতে আয়েষার আলেখ্য উন্মোচিত হইতেছে—ইহার সহিত শেষ অঙ্কিত চিত্রের তুলনা করিতে পারিলেই আমার বিষয়বস্তু স্পষ্টীকৃত হইবে, আর সঙ্গে সঙ্গে আপনারাও প্রচুর আনন্দ লাভ করিবেন।

আয়েষা

আয়েষার বয়ঃক্রম দ্বাবিংশতি বৎসর হইবে। আয়েষা দেখিতে পরমসুন্দরী, কিন্তু সে রীতির সৌন্দর্য দুই-চারি শব্দে সেরূপ প্রকটিত করা দুঃসাধ্য। তিলোত্তমাও পরমরূপবতী, কিন্তু আয়েষার সৌন্দর্য সে রীতির নহে; স্থিরযৌবনা বিমলারও একাল পর্যন্ত রূপের ছটা লোকমনোমোহিনী ছিল; আয়েষার রূপরাশি তদনুরূপও নহে।

কোন কোন তরুণীর সৌন্দর্য বাসন্তী মল্লিকার ন্যায় নবস্ফুট, ব্রীড়াসঙ্কুচিত, কোমল, নির্মল, পরিমলময়। তিলোত্তমার সৌন্দর্য সেইরূপ। কোন রমণীর রূপ অপরাহ্নের স্থলপদ্মের ন্যায় নির্বাস, মুদ্রিতোন্মুখ, শুষ্কপল্লব অথচ সুশোভিত, অধিক বিকশিত, অধিক প্রভাবিশিষ্ট, মধুপরিপূর্ণ। বিমলা সেইরূপ সুন্দরী। আয়েষার সৌন্দর্য নবরবিকরফুল্ল জল-নলিনীর ন্যায় সুবিকাশিত, সুবাসিত, রসপূর্ণ, রৌদ্রপ্রদীপ্ত, না-সঙ্কুচিত না-বিশুষ্ক, কোমল অথচ প্রোজ্জ্বল; পূর্ণ-দলরাজি হইতে রৌদ্র প্রতিফলিত হইতেছে. অথচ মুখে হাসি ধরে না। পাঠক মহাশয়, 'রূপের আলো' কখন দেখিয়াছেন? না দেখিয়া থাকেন, শুনিয়া থাকিবেন। অনেক সুন্দরী রূপে 'দশ দিক্ আলো' করে। শুনা যায়,

অনেকের পুত্রবধূ ঘর আলো করিয়া থাকেন। ব্রজধামে আর নিশুম্ভের যুদ্ধে কালো রূপেও আলো হইয়াছিল। বস্তুতঃ পাঠক মহাশয় বুঝিয়াছেন, 'রূপের আলো' কাহাকে বলে? বিমলা রূপে আলো করিতেন, কিন্তু সে প্রদীপের আলোর মত একটু একটু মিট্‌মিটে, তেল চাই, নহিলে জ্বলে না; গৃহকার্যে চলে,—নিয়ে ঘর কর, ভাত রান্ধ, বিছানা পাড়, সব চলিবে; কিন্তু স্পর্শ করিলে পুড়িয়া মরিতে হয়। তিলোত্তমাও রূপে আলো করিতেন—সে বালেন্দু-জ্যোতির ন্যায়,—সুবিমল, সুমধুর, সুশীতল; কিন্তু তাহাতে গৃহকার্য হয় না—তত প্রখর নয় এবং দূরনিঃসৃত। আয়েষাও রূপে আলো করিতেন, কিন্তু সে পূর্বাহ্নিক সূর্যরশ্মির ন্যায়,—প্রদীপ্ত, প্রভাময়, অথচ যাহাতে পড়ে, তাহাই হাসিতে থাকে।

যেমন উদ্যানমধ্যে পদ্মফুল, এ আখ্যায়িকামধ্যে তেমনি আয়েষা, এ জন্য তাঁহার অবয়ব পাঠক মহাশয়ের ধ্যান-প্রাপ্য করিতে চাহি। যদি চিত্রকর হইতাম, যদি এইখানে তূলি ধরিতে পারিতাম, যদি সে বর্ণ ফলাইতে পারিতাম; না চম্পক, না রক্ত, না শ্বেত-পদ্মকোরক, অথচ তিনই মিশ্রিত, এমন বর্ণ ফলাইতে পারিতাম; যদি সে কপাল তেমনি নিটোল করিয়া আঁকিতে পারিতাম,—নিটোল অথচ বিস্তীর্ণ, মন্মথের রঙ্গভূমি-স্বরূপ করিয়া লিখিতে পারিতাম; তাহার উপরে তেমনই সুবঙ্কিম কেশের সীমা-রেখা দিতে পারিতাম; সে রেখা তেমনই পরিষ্কার, তেমনই কপালের গোলাকৃতির অনু-গামিনী করিয়া আকর্ণ টানিতে পারিতাম; কর্ণের উপরে সে রেখা তেমনই করিয়া

ঘুরাইয়া দিতে পারিতাম; যদি তেমনই কালো রেশমের মত কেশগুলি লিখিতে পারিতাম, কেশমধ্যে তেমনই করিয়া কপাল হইতে সীঁতি কাটিয়া দিতে পারিতাম,—তেমনই পরিষ্কার, তেমনই সূক্ষ্ম; যদি তেমনই করিয়া কেশ রঞ্জিত করিয়া দিতে পারিতাম; যদি তেমনই করিয়া লোল কবরী বাঁধিয়া দিতে পারিতাম; যদি সে অতিনিবিড় ভ্রূযুগ আঁকিয়া দেখাইতে পারিতাম; প্রথমে যথায় দুইটি ভ্রূ পরস্পর সংযোগাশয়ী হইয়াও মিলিত হয় নাই, তথা হইতে যেখানে যেমন বর্ধিতায়তন হইয়া মধ্য-স্থলে না আসিতে আসিতেই যেরূপ স্থূল-রেখ হইয়াছিল, পরে আবার যেমন ক্রমে ক্রমে সূক্ষ্মাকারে কেশবিন্যাস-রেখার নিকটে গিয়া সূচ্যগ্রবৎ সমাপ্ত হইয়াছিল, তাহা যদি দেখাইতে

পারিতাম; যদি সেই বিদ্যুদগ্নিপূর্ণ মেঘবৎ চঞ্চল, কোমল, চক্ষুঃপল্লব লিখিতে পারিতাম; যদি সে নয়নযুগলের বিস্তৃত আয়তন লিখিতে পারিতাম; তাহার উপরিপল্লব ও অধঃপল্লবের সুন্দর বঙ্কভঙ্গী, সে চক্ষুর লীলালক্তক-প্রভা, তাহার ভ্রমরকৃষ্ণ স্থূল তারা লিখিতে পারিতাম; যদি সে গর্ববিস্ফারিত রন্ধ্র-সমেত সুনাসা; সে রসময় ওষ্ঠাধর; সে কবরীস্পৃষ্ট প্রস্তরশ্বেত গ্রীবা; সে কর্ণাভরণ-স্পর্শপ্রার্থী পীবরাংস; সে স্থূল, কোমল, রত্নালঙ্কার-খচিত বাহু; যে অঙ্গুলিতে রত্নাঙ্গুরীয় হীনভাস হইয়াছে, সে অঙ্গুলি; সে পদ্মারক্ত, কোমল করপল্লব; সে মুক্তাহার-প্রভানিন্দী পীবরোন্নত বক্ষ; সে ঈষদ্দীর্ঘ বপুর মনো-মোহন ভঙ্গী;—যদি সকলই লিখিতে পারিতাম, তথাপি তূলি স্পর্শ করিতাম

না। আয়েষার সৌন্দর্যসার, সে সমুদ্রের কৌস্তুভরত্ন—তাঁহার ধীর কটাক্ষ। সন্ধ্যাসমীরণ-কম্পিত নীলোৎপল-তুল্য ধীরমধুর কটাক্ষ! কি প্রকারে লিখিব?

প্রশান্ত সুদীর্ঘ সরোবর-সদৃশ দীর্ঘায়তন আয়েষার রূপচ্ছবি ভাল, না এই শীর্ণসলিলা, স্নিগ্ধতোয়া, গিরিনিঃসৃতা, ঝির্‌ঝির করিয়া প্রবাহিতা ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী-সদৃশ শ্রীর অঙ্গের সোণালী শ্রীটুকু শ্রেষ্ঠ?

বাইশ

শ্রী, নন্দা, রমা, জয়ন্তী

সীতারাম মনে মনে আবার ভাবিলেন, 'শ্রী, এমন শ্রী? তা ত জানি না। আগে শ্রীর কাজ করিব, তারপর অন্য কথা।'

* *

নন্দা তপ্তকাঞ্চনশ্যামাঙ্গী।

* *

রমা হিমরাশি-প্রতিফলিত কৌমুদী-রূপিণী।

*   *

একজন বসন্তনিকুঞ্জ-প্রহ্লাদিনী অপূর্ণা কল্লোলিনী, আর একজন বর্ষাবারিরাশি-প্রমথিতা পরিপূর্ণা স্রোতস্বতী। দুই স্রোতে শ্রী ভাসিয়া গেল।

*   *

রমা বড় ছোট মেয়েটি, জলে ধোয়া যূঁই ফুলের মত বড় কোমল-প্রকৃতি। তাহার পক্ষে এই জগতের যাহা-কিছু সকলই দুর্জ্ঞেয় বিষম পদার্থ—সকলই তাহার কাছে ভয়ের বিষয়। বিবাদে রমার বড় ভয়। ··· সেই কাঁদাকাটি, হাতেধরা, পায়েপড়া, মাথাখোঁড়া—ঘ্যান-ঘ্যান্, প্যান্প্যান্—কখনও মুষলের ধার, কখনও ইল্‌শে গুঁড়ি, কখনও কাল-বৈশাখী, কখনও কার্তিকের ঝড়।

ধূম্বোটা সেই এক—মুসলমানের পায়ে কাঁদিয়া পড়, নহিলে কি বিপদ্ ঘটিবে।

*   *

(গঙ্গারাম ভাবিতেছিল)—রমার মুখখানি বড় সুন্দর। কি সুন্দর আলোই তার উপর পড়িয়াছিল।... বাতির আলো বলিয়াই কি অমন দেখাইল? তা হ'লে মানুষ রাত্রিদিন আলো জ্বালিয়া বসিয়া থাকে না কেন? কি মিস্‌মিসে কোঁকড়া কোঁকড়া চুলের গোছা! কি ফলান রঙ্! কি ভুরু! কি চোখ! কি ঠোঁট!—যেমন রাঙ্গা, তেমনই পাত্‌লা! কি গড়ন!... সবই যেন দেবীদুর্লভ!... মানুষ যে এমন সুন্দর হয়, তা জান্‌তেম না! এবার যে দেখিলাম, আমার যেন জন্ম সার্থক হইল। আমি তাই ভাবিয়া যে কয় বৎসর বাঁচিব সুখে কাটাইতে পারিব।

*   *

সন্ন্যাসিনী (জয়ন্তী) অতিশয় সুন্দরী —বুঝি শ্রীর অপেক্ষাও সুন্দরী। কিন্তু রূপ ঢাকিবার জন্য আচ্ছা করিয়া বিভূতি মাখিয়াছিল; তাহাতে হিতে বিপরীত হইয়াছিল—যথা ফানুসের ভিতর আলোর মত রূপের আগুন আরও উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল।

তেইশ

আনন্দমঠের ভবানন্দ পরস্ত্রী কল্যাণীর 'বড সুন্দর' মুখখানি যে ভাষায় ও যে ভাবধারায় চিন্তা করিয়াছিল, তাহার সঙ্গে গঙ্গারামের পরস্ত্রী রমার 'বড় সুন্দর' মুখখানি ভাবিবার ভাব ও ভাষার দ্যোতনা তুলনা করিলেই শিল্পীর শিল্প-নৈপুণ্যে প্রাণ-মন ভরিয়া উঠে।

এখন শ্রেষ্ঠ শিল্পী তাঁহার পরিণত বয়সে এক একটা তূলির টানে এক একটি সৌন্দর্য্য-ললামভূতা অনবদ্য সুন্দরীর প্রতিচ্ছবি অঙ্কিত করিতেছেন—

এ বলে, 'আমায় দেখ্,' ও বলে, 'কেন, আমায় দেখ্,' সে বলে, 'না, তা কি হয়,—আমায় দেখ্!'

এই সকল ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র অথচ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম নিখুঁত ছবিগুলির সম্বন্ধে কোন কথা বলিতে গেলেই সেগুলির চমৎকারিত্ব ক্ষুণ্ণ করিয়া বসিব। এই সব হীরার টুকরাগুলির আলোচনা করা দূরে থাকুক, এইগুলিকে লইয়া নাড়াচাড়া করিতে যাওয়াও মহাবিড়ম্বনা ও বিপজ্জনক ব্যাপার—কি জানি, যদি গোলেমালে এক-আধখানি হারাইয়া যায়, তবে এই দুষ্প্রাপ্য রত্নের অভাব পূরণ হইবে কি দিয়া? আমাকে এক শ' বার বেচিলেও ত সিকিখানির দাম উঠিবে না! আমি রত্নব্যবসায়ী জহুরী নয়—জহর লইয়া ছেলেখেলা করিব না।

বলিয়াছি, সীতারামই বঙ্কিমচন্দ্রের শেষ উপন্যাস। ইহার রূপচ্ছবির নিদর্শন পাইলেন, আমার কথাও প্রায় শেষ হইয়া আসিল। আমার দুর্বুদ্ধিবশতঃ মহাসাগরে ঝাঁপ দিয়াছিলাম মণি-মুক্তার লোভে। একখানিও তুলিতে পারিয়াছি কি? পাঠকেরা জানেন। আমি কিন্তু জানি যে, একটাও মুক্তা তুলিতে পারিয়াছি কি না ঠিক

বলিতে পারি না, তবে মুক্তার লোভে পড়িয়া, অকূল পাথারে ডুব দিয়া আমার যে প্রাণটুকু পর্যন্ত যাইতে বসিয়াছিল, তাহা আমার চাইতে বেশি করিয়া আর কেহই জানেন না। এই দুঃসাহসিকতার কথা মনে হইতেছে, আর আমার সারা দেহে কাঁটা দিয়া উঠিতেছে।

চব্বিশ

অশ্রুপূর্ণা শ্রীর শান্তিময় স্নিগ্ধচ্ছবি দেখিয়াছি, এইবার ব্রহ্মচারিণী শ্রীর সন্ন্যাসিনী মূর্তি দেখিয়া নয়ন-মন সার্থক করিব।

সন্ন্যাসিনী শ্রী

সদ্যঃপ্রস্ফুটিত প্রাতঃপুষ্পের যেমন পূর্ণ-স্বাস্থ্য—কোথাও অপুষ্ট নয়, কোথাও অঙ্গহীন নয়, কোথাও বিবর্ণ নয়, কোথাও বিশুষ্ক নয়—সর্বত্র মসৃণ, সম্পূর্ণ, শীতল, সুবর্ণ,—শ্রীর তেমনই স্বাস্থ্য, শরীর সম্পূর্ণ,—সেই জন্য শ্রী প্রকৃতির মূর্তিমতী

শোভা। তারপর চিত্ত প্রশান্ত, ইন্দ্রিয়-ক্ষোভশূন্য, চিন্তাশূন্য, বাসনাশূন্য, ভক্তি-ময়, প্রীতিময়, দয়াময়,—কাজেই সেই সৌন্দর্যের বিকার নাই, কোথাও একটা দুঃখের রেখা নাই, একটুমাত্র ইন্দ্রিয়-ভোগের ছায়া নাই, কোথাও চিন্তার চিহ্ন নাই; সর্বত্র সুমধুর, সুহাস্য, সুখময়!—এ ভুবনেশ্বরী মূর্তির কাছে সে সিংহবাহিনী মূর্তি কোথায় দাঁড়ায়!

তাই কি? আমরা কিন্তু সে সিংহবাহিনী রণ-রঙ্গিণী মূর্তি নয়ন ভরিয়া দেখিয়া গ্রন্থশেষে সেই রণচণ্ডীর উদ্দেশে প্রণত হইতেছি, আর সেই সঙ্গে যে প্রবীণ কৃতবিদ্য কুম্ভকার এই অপরূপ রূপময়ী দেবীকে পাকা হাতে গড়িয়া অমর হইয়া আছেন, তাঁহাকে স্মরণপূর্বক তাঁহারও উদ্দেশে শ্রদ্ধার অঞ্জলি অর্পণ করিয়া কৃতকৃতার্থ হইতেছি।

সিংহবাহিনী শ্রী

মহামহীরুহের শ্যামল-পল্লবরাশি-মণ্ডিতা চণ্ডীমূর্তি দুই শাখায় চরণ স্থাপন করিয়া, বামহস্তে এক কোমল শাখা ধরিয়া, দক্ষিণ হস্তে অঞ্চল ঘুরাইতে ঘুরাইতে ডাকিতেছে,—'মার্ মার্! শত্রু মার্!' —অঞ্চল ঘুরিতেছে, অনাবৃত আলুলায়িত কেশদাম বায়ুভরে উড়িতেছে, দৃপ্ত পদভরে যুগলশাখা দুলিতেছে, উঠিতেছে, নামিতেছে,—সঙ্গে সঙ্গে সেই মাধুরীময় দেহ উঠিতেছে, নামিতেছে—যেন সিংহবাহিনী সিংহপৃষ্ঠে দাঁড়াইয়া রণরঙ্গে নাচিতেছেন,—যেন মা অসুরবধে মত্ত হইয়া ডাকিতেছেন,—'মার্! মার্! শত্রু মার্!' শ্রীর আর লজ্জা নাই, জ্ঞান নাই, ভয় নাই, বিরাগ নাই—কেবল ডাকিতেছেন,—'মার্! শত্রু মার্! দেবতার শত্রু, মানুষের শত্রু, হিন্দুর শত্রু,

আমার শত্রু মার্! শত্রু মার্!' উত্থিত বাহু,—কি সুন্দর বাহু; স্ফুরিত অধর, বিস্ফারিত নাসা, বিদ্যুন্ময় কটাক্ষ, স্বেদাক্ত ললাটে স্বেদবিজড়িত চূর্ণকুন্তলের শোভা!

ঘোররূপে মহারাবে
সর্বশত্রুবশঙ্করি।
ভক্তেভ্যো বরদে দেবি
ত্রাহি মাং শরণাগতম্॥

বন্দে মাতরম্

———

